إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৪ বর্ষ ।। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪১১ হিঃ ।। ৬ই আশ্বিন, ১৩৯৮ বাংলা ।। ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন ঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ সর্বোত্তম চরিত্র
অনুবাদক ঃ মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী ৪

জুমুআর খুৎবা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ)
অনুবাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী ৬

মোস্তফা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ১৪

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনে বিবাহ
জনাব মকবুল আহমদ খান ১৭

যুবকদের আদর্শ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
জনাব কে. এম মাহমুদুল হাসান ২৪

প্রকৃত সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর সন্ধানে
জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ২৬

ইসলাম ও দাসপ্রথা
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২৮

সম্রাটগণের নিকট রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্র-২
অনুবাদক ঃ জনাব আব্দুল্লাহ্ শাম্‌স বিন তারেক ৩২

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর রসূল প্রেম
মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি, সদর মুরব্বী ৩৪

বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহান আদর্শ
মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী ৪৩

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর নারী জাতির উপর অনুগ্রহ
জনাবা মাসুদা সামাদ ৪৭

জেহাদ বিল্ কুরআন
জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান ৫০

মক্কা বিজয়
মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী ৫৪

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দূরদর্শিতা
মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী ৫৮

ছোটদের পাতা
পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৬৫

সংবাদ ৬৮

সম্পাদকীয়

মিলাদুন্নবী না সীরাতুন্নবী

ছোটবেলা শুনেছি মিলাদ শরীফ। উপমহাদেশের স্বাধীনতার পর শুনলাম মিলাদুন্নবী।

(অবশিষ্টাংশ ৭৩ পাতায় দেখুন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ (সীরাতুন্নবী-সাঃ সংখ্যা)

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ইং : ৩০শে তবুক, ১৩৭০ হিঃ শামসী : ১৪ই আশ্বিন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

আল্ কুরআনে
রাহমাতুল্লিল আলামীন—মুহাম্মদ (সাঃ)

"এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিত্ত হইয়াছ, (১) যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর-চিত্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৬০)

"নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, দয়াময়।" (২) (সূরা তাওবা : আয়াত ১২৮)

---

(১) এই শব্দগুলি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার ভদ্রোচিত, প্রীতিপূর্ণ ও সদাশয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রহিয়াছে সর্বব্যাপী দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য সাধারণ গুণ, যাহা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিত। মানব-হিতৈষণা ও কৃপা-করুণায় তিনি এতই ভরপুর ছিলেন যে, কেবল নিজের সাথীগণ ও অনুসারীদের প্রতিই তিনি দয়া দেখান নাই, বরং তাঁহার প্রাণঘাতী শত্রুরাও তাঁহার দয়া-মায়া ও স্নেহ-প্রীতি হইতে সমভাবে অংশ পাইয়াছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যে সকল মোনাফেক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও তিনি শাস্তি দান হইতে বিরত থাকেন। এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাদের পরামর্শ গ্রহণেও বিরত হন নাই।

(২) এই আয়াত মো'মেন এবং কাফের উভয়ের জন্য প্রযোজ্য—বিশেষভাবে প্রথমোক্তদের প্রতি। ইহার প্রথমাংশ কাফেরদের প্রতি এবং শেষাংশ মো'মেনগণের জন্য প্রযোজ্য। মনে হয় ইহা কাফেরদিগকে বলিতে চাহে : তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ

"অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আত্ম বিনাশ (৩) করিয়া ফেলিবে?"

(সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৭)

"এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।" (৪)

(সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৮)

অর্থাৎ যদিও তোমরা তাহাকে সর্বপ্রকার বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার করিয়াছ তথাপি তাহার হৃদয় মানবীয় মায়া-মমতায় এতই পরিপূর্ণ যে, তোমাদের নির্যাতন যত কঠোরই হউক না কেন তাহা তোমাদের বিরুদ্ধে তাহাকে বিরূপ করিতে পারে না এবং সে তোমাদের অমঙ্গল কামনা করিতে পারে না। তোমাদের প্রতি সে এতই দয়ালু এবং সহানুভূতিপূর্ণ যে, সে ইহা সহ্য করিতে পারে না যে, তোমরা সৎ ও সাধু পথ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং উহার ফলে, তোমরা নিজদিগকে কষ্টে ফেলিয়া দাও। মো'মেনদিগকে এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, রসূল পাক (সাঃ) তোমাদের জন্য ভালবাসা, করুণা ও অনুকম্পায় ভরপুর অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ-বেদনায় তোমাদের সহিত সে সানন্দে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত সে স্নেহশীল পিতার মত অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে।

(৩) 'বা-খেউন' (সকর্মক ক্রিয়া বিশেষণ পদ) 'বাখাআ' হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ, সে যথোপযুক্তভাবে ইহা করিল। নিজের জাতির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য নবী করীম (সাঃ) এর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার একটি জোরালো প্রমাণ এই আয়াত। তাহারা যে ঐশী-বাণী ও শিক্ষার বিরোধিতা করিতেছে এবং ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে ইহার দরুণ তাঁহার মর্ম-যন্ত্রণা তাঁহাকে প্রায় মৃত্যুর নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্‌ তা'লার নবী ও রসূলগণ পরম স্নেহময়ী ও হিতাকাঙ্খিনী মায়ের ন্যায় মানবের প্রতি অশেষ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহারা মানবজাতির জন্য নিদারুন দুঃখ পান এবং আকুল ক্রন্দন করেন এবং মর্মযাতনায় কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ, যাহাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌-তা'লার নবীগণ অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহারাই আল্লাহর নবীদিগকে নির্যাতন, উৎপীড়ন এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়া থাকেন।

(৪) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ ও রহমত স্বরূপ, যেহেতু তাঁহার বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁহার মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ পূর্বে কখনও তাহাদের উপর আল্লাহ্‌-তা'লার রহমত এরূপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয় নাই।

হাদিস শরীফ

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ
সদর মুরব্বী

সর্বোত্তম চরিত্র

কুরআন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (سورة احزاب : ٢٢)

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে।
(সূরা আহযাব : ২২)

হাদীস :

نعم المرء كان عامرا قال يا ام المومنين انبئينى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألیسى تقرأ القران قال قلت بلى قالت فان خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم القران (نسائى)

অর্থাৎ আমের (রাঃ) অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মুল মুমেনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমের বলল, কেন (পড়ব) না? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরিত্র তো কুরআনই ছিল। (নিসাঈ)

ব্যাখ্যা :

হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর পুণ্যময় সত্তা ছিল অনুপম চরিত্র মাধুরী, মহোত্তম গুণাবলী ও সর্ববিধ সৌন্দর্যে সুষমন্বিত ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌তা'লা চরিত্রের সকল মাধুর্য ও উচ্চ গুণাবলী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য হতে কেউ বঞ্চিত হয় নি। এমন কি বৃক্ষ ও জীব-জন্তুও ইহার অন্তর্ভুক্ত। দিন রাত মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকতেন তিনি। বিরোধিতা হতো, নিপীড়িত হতেন কিন্তু মুখের হাসি ম্লান হতো না। দুঃখ কষ্ট সহ্য করতেন। কিন্তু এহেন অবস্থায় কর্কষতা অথবা দুঃখের ছাপ থাকত না তার চেহারায়। পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন তিনি। মূর্খ ও অজ্ঞদের সাথে তাঁর ব্যবহার ও আচরণে বিন্দু মাত্র পার্থক্য হতো না। তাঁর জীবন ছিল কুরআনের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। কুরআন যা বলে তিনি তা করতেন এবং যা হতে বিরত থাকতে বলে তা হতে তিনি বিরত থাকতেন। তিনি (সাঃ) ছিলেন কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই তো খোদাতা'লা তাঁকে মানব জাতির জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। আর আদেশ দিয়েছেন যে, এই রসূল (সাঃ) এর অনুকরণ ও অনুসরণ কর তাহলে আমাকে পাবে। আমরা তাঁর (সাঃ) উম্মত সে হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব আমরা যেন নিজেদের জীবনে তাঁর শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করি। তাঁর চরিত্রকে তাঁর জীবনকে নিজেদের জীবনের পাথেয় করি তাহলেই আমরা পঙ্কিলতা মুক্ত হতে পারবো, পাপ মুক্ত হতে পারবো। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে হুযুর (সাঃ)-কে অনুসরণ করার তৌফীক দিন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অসাধারণ নবী (সাঃ) যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় গুণাবলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর কীর্তির কষ্টিপাথরে সুপ্রতিষ্ঠিত

অনুবাদঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
সদর মুরব্বী

"জগতে আল্লাহ্‌র এক মহিমান্বিত রসূল (হযরত মুহাম্মদ-সাঃ) আসিয়াছেন, যাহাতে সেই সকল (আধ্যাত্মিক) বধিরদিগকে কর্ণ দান করেন, যাহারা আজ হইতে নয় বরং শত সহস্র বৎসর ধরিয়াই বধির। কে অন্ধ এবং কে বধির? সেই ব্যক্তি অন্ধ ও বধির যে তৌহীদ গ্রহণ করে নাই এবং সেই রসূলকেও গ্রহণ করে নাই, যিনি নূতনভাবে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে তৌহীদকে কায়েম করিয়াছেন। সেই রসূল যিনি বন্য ও পশু-স্তরের লোকদিগকে সভ্য মানুষে এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর, চরিত্রবান মানুষদিগকে খোদা-যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত করিয়া এলাহী রঙে রঙীন করিয়াছেন। সেই রসূল, হাঁ, সত্যের সেই প্রজ্জোলসূর্য, যাহার পদতলে সহস্র সহস্র মৃত শির্‌ক (অংশীবাদিতা), নাস্তিকতা, অবাধ্যতা ও পাপাচারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছে এবং কার্যকররূপে যিনি কিয়ামতের নমুনা ও দৃশ্য দেখাইয়াছেন। যীশুর ন্যায় শুধু বাগাড়ম্বর ও নীতিবাক্য উচ্চারণেই ক্ষান্ত হন নাই। সেই মহানবী (সাঃ) মক্কায় আবির্ভূত হইয়া শির্‌ক এবং মানব-পূজার গভীর অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়াছেন। হাঁ্যা, জগতের প্রকৃত জ্যোতিঃ একমাত্র তিনিই ছিলেন; তিনি জগতকে তমাসাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া বাস্তবিকপক্ষে সেই আলো দান করিয়াছিলেন যাহা অন্ধকার রাত্রিকে দিন করিয়াছিল। তাঁহার আগমনের পূর্বে জগৎ কি ছিল? অতঃপর, তাঁহার আগমনের পর তাহা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল? ইহা এমন কোন প্রশ্ন নয়, যাহার উত্তর মোটেও কঠিন হইতে পারে; যদি আমরা বে-ঈমানীর পথ অবলম্বন না করি তাহা হইলে আমাদের বিবেক (Conscience)

নিশ্চয়ই আমাদের অঞ্চল ধরিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে যে, এই মর্যাদাবান রসূলের পূর্বে 'খোদাতা'লার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেই প্রকৃত মা'বুদ (উপাস্য)-এর সকল গৌরব ও মর্যাদা অবতার দেব-দেবী, প্রস্তর, তারকা নক্ষত্র-গাছ-বৃক্ষ ও জীব-জন্তু এবং মরণশীল মানবদিগকে দান করা হইয়াছিল এবং তুচ্ছ ও হীন সৃষ্ট জীবকে সেই মহাপ্রতাপশালী ও পবিত্রতম খোদার স্থান ও আসনে বসানো হইয়াছিল। আর ইহা একটি নির্ভুল ও সঠিক সিদ্ধান্ত যে, যদি এই সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-বৃক্ষ এবং তারকা-নক্ষত্রই খোদা স্বরূপ হইত—যেগুলির মধ্যে যীশুও একজন, তাহা হইলে বলা যাইত, এই রসূলের কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু যেহেতু (যীশু সহ) এ সকল জিনিস কখনও খোদা ছিল না, সেহেতু সেই দাবী এক মহা জ্যোতিঃ বহন করে, যে দাবী হযরত সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কার পর্বত মালার উপড়ে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই দাবী কি ছিল? তাহা ছিল এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "খোদাতা'লা জগতকে শির্‌কের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া সেই অন্ধকারকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" উহা শুধু একটা দাবীই ছিল না বরং রসূলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উক্ত দাবীকে বাস্তবে পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দেন। যদি কোন নবীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার সেই সকল কীর্তির দ্বারা প্রতীয়মান হইতে পারে যে সকল কীর্তির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ও সত্যিকার সহানুভূতি সকল নবীদের তুলনায় অধিক পর্যায়ে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে হে সমগ্র মানবকুল! উঠ এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে জগতের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কোন নযীর নাই।

সৃষ্টির উপাসকগণ এই মহামহিমান্বিত রসূলকে চিনে নাই, সনাক্ত করে নাই, যিনি সত্যিকার সহানুভূতির সহস্র সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি, সেই সময় এখন সমাগত, যখন এই পবিত্রতম রসূল (সাঃ)-কে সনাক্ত করা হইবে সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। ইচ্ছা করিলে তোমরা আমার কথা লিখিয়া রাখ যে, এখন হইতে মৃতের উপাসনা ক্রমশঃই স্তিমিত ও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, এমন কি উহা নাস্তনাবুদ হইবে ও চিরতরে লোপ পাইবে। মানুষ কি খোদার মোকাবিলা করিতে পারিবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদাতা'লার ইচ্ছা ও সংকল্প সমুদয়কে রদ করিতে পারে? নশ্বর আদম-সন্তানের পরিকল্পনাসমূহ কি ঐশী নির্দেশসমূহকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইবে? হে শ্রবণকারীগণ! শুন, হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ! প্রণিধান কর এবং স্মরণ রাখ যে, সত্য প্রকাশিত হইবে এবং সেই যে প্রকৃত জ্যোতিঃ উহা দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইবে।" (তবলীগে রেসালত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ)

[২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরব্বী

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইহার শিক্ষা মানিয়া চলিলে শান্তি, সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

কুরআন করীম সকল মানুষকে সাম্যের এক উচ্চ মার্গে দাঁড় করাইয়াছে এবং মুমেন ও কাফেরের মধ্যেও মানুষ হিসাবে কোন পার্থক্য করে নাই।

ইসলামী শিক্ষায় মুমেন ও কাফের উভয়ের হক ও অধিকার এবং অন্যান্য সকলের যাবতীয় হক ও অধিকার নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করণকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই।

যে ব্যক্তি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় পদচিহ্নাবলীর অনুসরণ করে না, সে তাঁহার (সাঃ) প্রতি খিয়ানতকারীর অপরাধে অপরাধী।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করার পর হুযূর (রাহঃ) বলেন :

হযরত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 'রহমাতুল্লিল-আলামীন' রূপে সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। 'রহমাতুল্লিল-আলামীন'-এর মধ্যে শুধু মানুষেরই উল্লেখ নয় বরং অন্য যাবতীয় সৃষ্টিও উহার আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তিনি শুধু মানুষের জন্যই রহমত বা করুণা স্বরূপ নহেন এবং মানুষ ছাড়া খোদার অন্যান্য মখলুক তথা নিখিল সৃষ্টির জন্যই তিনি করুণা ও রহমত স্বরূপ, এবং ইসলামী বিধান ও শিক্ষা আদ্যোপান্ত মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টির সম্যক হক ও অধিকার ব্যক্ত করে এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণেরও উপায় উদ্ভাবন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেহেতু আলামীনের (সমগ্র বিশ্ব) জন্য রহমত স্বরূপ এবং মানুষ আলামীনেরই অংশ বিশেষ, সেইহেতু আলামীনের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্যও তিনি রহমত স্বরূপ। অবশ্য এই মহান করুণার বৃহদাংশ মানুষই প্রাপ্ত হইয়াছে। তারপর ঘোষণা করা হইয়াছে :

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (الاعراف ١٥٩)

—"আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।" এবং كافة للناس بشيرا و نذيرا (سبا : ٢٩) 'সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে আসিয়াছি।

মানুষের জন্য তাঁহার (সাঃ) যে মহান জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়াছে উহার দুইটি দিক আছে : একটি এই যে, প্রত্যেক মানুষকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, ইসলামের শিক্ষা তোমাদের জন্য শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। ইহা শান্তির ধর্ম, নিরাপত্তার ধর্ম। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তোমাদিগকে ঝগড়া-বিবাদ করিতে দেওয়া হইবে না বরং যদি তোমরা ইসলামী আদেশ নিষেধ কার্যকরী রূপে পালন করিয়া চল, তাহা হইলে এই শিক্ষা তোমাদের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার নিমিত্তেই নাযেল করা হইয়াছে। ইহা পালন করিলে শান্তির পরিমণ্ডল বিরাজ করিবে।

আর দ্বিতীয় দিকটি এই যে, মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মান ও সম্ভ্রমের যে মাকাম ও আসন মানবজাতিকে আল্লাহ্‌তা'লা দান করিতে চাহেন তাহা দান করার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ (সাঃ) প্রেরিত হইয়াছেন, এবং তিনি মানুষের জন্যই ইহার সম্ভাব্যতা বিধান করিয়াছেন এই ঘোষণার মাধ্যমে যে, قل انما انا بشر مثلكم (كهف : ١١١) অর্থাৎ, মোহাম্মদ (সাঃ) যেমন অতি মহান ও পরম সম্মানিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষও অত্যন্ত সম্মান ও ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আর ইহার জন্য জরুরী, মানুষে মানুষে যেন পার্থক্য করা না হয়! বরং সকল মানুষকে সাম্যের এক উচ্চমার্গে উপনীত করা হয়। আদ্যোপান্ত সমগ্র কুরআন করীমের সকল আদেশ ও শিক্ষার প্রতি আপনি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করুন, কোথাও মুমেন ও কাফেরের মধ্যে মানুষ হিসাবে পার্থক্য করা হয় নাই। উহার কতিপয় দিকের উপর আমি পূর্বে কয়েকটি খোৎবায় আলোকপাত করিয়াছি। আজ আমি দুইটি দিক বাছিয়া লইয়াছি। একটির সম্পর্ক 'নওয়াহী' (অর্থাৎ নিষেধমূলক নির্দেশাবলী)-এর সহিত এবং অপরটি 'ওয়ামের' (অর্থাৎ আদেশমূলক নির্দেশাবলী)-এর সহিত সম্পৃক্ত। আজ আমি খিয়ানত বা আত্মসাৎ এবং আদল ও ইনসাফ বা ন্যায়-বিচার সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চাই।

আল্লাহ্‌তা'লা সূরা আনফালে বলেন :

يايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا امانتكم و انتم تعلمون ○
(انفال : ٢٨)

—"হে মুমেনগণ! আল্লাহ্‌ ও রসূলের খেয়ানত করিও না এবং পরস্পরের আমানত-সমূহেও খেয়ানত করিও না।" (সূরা আনফাল : ২৮ আয়াত) তারপর আল্লাহ্‌ সূরা নেসায় বলেন : ولا تكن للخائنين خصيما এবং সূরা আনফালে বলেন : ان الله لا يحب الخائنين "খিয়ানতকারীদের পক্ষে ঝগড়াকারী (অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ সমর্থনকারী) হইও না। আল্লাহ্‌-

তা'লা খিয়ানতকারীদিগকে ভালবাসেন না। যদি তুমি তাহাদের পক্ষ সমর্থনে ঝগড়া কর, তাহা হইলে তুমিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে।'' আল্লাহ্‌তা'লা আরও বলিয়াছেন :

ان الله لا يهدى كيد الخائنين (يوسف : ٥٣)

—খিয়ানতকারীদের কৌশলকে নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা সফল হইতে দেন না।'' খিয়ানতের অর্থ 'মুফরদাত ইমাম রাগিব' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে :—

الخيانة والنفاق واحد الا ان الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والامانة والنفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلون فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد فى السر و نقيض الخيانة الامانة -

"খিয়ানত ও নেফাক প্রায় সমঅর্থবহ। অঙ্গীকার ও গচ্ছিত আমানতে বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে খিয়ানত বলা হয় এবং নেফাক বা কপটতা অর্থে মুনাফেকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। ধর্ম আকায়েদ, দাবী ও আমলের দিক দিয়া বিশ্বাস ভঙ্গের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হয়। তারপর কখনও উক্ত শব্দদ্বয় পরস্পর সমঅর্থও প্রকাশ করে। 'খিয়ানত'-এর অর্থ হক্ ও সত্যের বিরোধিতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ; ইহা আমানত শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।''

যে আয়াতগুলি আমি উপরে উপস্থাপন করিলাম, এইগুলি হইতে নিম্নরূপ বিষয়াবলী প্রতিপাদিত হয় :—

প্রথম, বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র খিয়ানত করিও না। এবং খিয়ানত হইল আমানতের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। আর আমানতের অর্থ হইল : مافرض الله على العباد "বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌ যাহা ফরয বা বাধ্যকর হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন।'' ইহা আমানতের একটি অর্থ। সুতরাং যখন বলা হইল যে, 'আল্লাহ্‌র খিয়ানত করিবে না', তখন এ আদেশই দেওয়া হইল যে, আল্লাহ্‌তা'লা যে সকল ফরয বা দায়িত্বাবলী ন্যাস্ত করিয়াছেন সেই সকল দায়িত্ব পূর্ণ কর, যে সকল অঙ্গীকার তোমাদের নিকট গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলি পালন কর, যেসকল হক্ ও অধিকার কায়েম করিতে বলা হইয়াছে সেগুলিকে কায়েম কর এবং খোদাতা'লার বান্দাগণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করিও না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি খিয়ানত করিও না। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকার আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইল এই যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে 'উসওয়া-এ-হাসানা'— যে 'উৎকৃষ্টতম আদর্শপূর্ণ দৃষ্টান্ত' তোমাদের সামনে পেশ করিয়াছেন তদনুযায়ী তোমরা জীবন যাপন করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে তাঁহার আদর্শ পরিত্যাগ করে এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না সে খেয়ানতকারী।

তারপর আরও বলা হইয়াছে, পরস্পরের আমানতসমূহে খিয়ানত করিও না। ويخونوا امانتكم যেমন আমি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, 'পরস্পরের আমানত' বলতে কর্তব্য

ও অঙ্গীকার এবং পরস্পরের যে সকল হক্ ও অধিকার আল্লাহ্‌তা'লা নির্ধারণ করিয়াছেন সেগুলিকে বুঝায়। মৌলিক ও নীতিগতভাবে ঐ সকল হক্ ও অধিকার বহুবিধ রহিয়াছে। আজ আমি আপনাদিগকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সেগুলির মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি নির্বাচন করিয়াছি। যেমন, (১) অর্থ বা সম্পদ সম্পর্কিত পারস্পরিক আমানতসমূহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কাহারও মাল আত্মসাৎ করিও না; ইহা অসততা ও খিয়ানত এবং আমানত বিরোধী কার্য। এরূপ কার্যের বিভিন্ন রূপ আমাদের সামনে আসে। যেমন এক ব্যক্তি তাহার ধন-সম্পদের একাংশ অন্যের নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখে। যাহার নিকট ইহা গচ্ছিত রাখা হয় তাহার কর্তব্য, যখনই তাহার নিকট প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার গচ্ছিত ধন-সম্পদ ফেরৎ চায় তখনই উহা তাহাকে ফেরৎ দেওয়া। (২) আবার ধন-সম্পদের এই হক্ নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, বেচা-কেনার সময় যতটুকু অর্থ কেহ দেয় সেই অনুযায়ী তাহাকে যেন সঠিক পণ্য দেওয়া হয়। যদি এক সের পণের দাম দুই টাকা হয় তাহা হইলে দোকান্দার দুই টাকা লইয়া যদি ওজনের সময় চাতুর্যের সহিত এক সেরের পরিবর্তে পনর ছটাক দেয় তাহা হইলে সে ধন-সম্পদ সম্পর্কিত হক্ হরণ করিল এবং খিয়ানতকারী সাব্যস্ত হইল। (৩) আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, কোন কোন লোক এতিমদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে। কুরআন করীম ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরও অনেকগুলি হেদায়াত দান করিয়াছে। আমরা আমাদের জীবন যাত্রার পথে প্রতিটি ব্যাপারে ঐ সকল হেদায়াত হইতে আলো গ্রহণ করিয়া হক্ ও সত্যের উপরে নিজেদের কর্মধারাকে কায়েম রাখিতে পারি।

অতঃপর, মানব জীবন ও প্রাণ সম্পর্কিত হক্ ও অধিকারসমূহের ব্যাপার রহিয়াছে। ইহা হইল পারস্পরিক আমানত সম্পর্কিত আর একটি শিরোনাম। জীবন ও প্রাণ সম্পর্কিত একটি স্বত্ব বা অধিকার তো হইল এই যে, বে-হক কাহারো প্রাণ হরণ করা যায় না। কুরআন করীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহা ঘোষণা করিয়াছে, যাহা এক বড় জবরদস্ত ঘোষণা। এই প্রসঙ্গে আর একটি হক্ বা অধিকার এই যে, এমন ফেৎনা (অশান্তি ও বিশৃংখলা, সৃষ্টি করিবে না যাহার ফলে কেহ দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়। الفتنة اشد من القتل —(অর্থাৎ, ফেৎনা কতল অপেক্ষাও ঘোরতর অপরাধ।) ইসলাম কাহারও প্রাণ হরণ করার চাইতে কাহাকেও শূলে আবদ্ধ রাখা এবং কাহারও জীবনকে উৎসন্ন ও দুর্বিষহ করিয়া তোলাকে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গুরুত্ব দিয়াছে।

প্রাণী বা মানবজীবনের হক্ ও অধিকার এই যে, উহার প্রতিপালন, পরিপোষণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে যাহা কিছুর প্রয়োজন তাহা যেন উহাকে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আরও বহু দৃষ্টান্ত পেশ করা যাইতে পারে।

তারপর মানুষের ইজ্জত ও সম্মান সম্পর্কীয় হক্ ও অধিকার রহিয়াছে। প্রতিটি মানুষ 'আশরাফুলমখলুকাত'-এর এক একজন সদস্য এবং খোদাতা'লার দৃষ্টিতে তাহার সৃষ্টি ও জন্মের দিক দিয়া, অতি সম্মানিত; তাহার শক্তি ও ক্ষমতা নিচয়ের দিক দিয়া, তাহার অপরিসীম

উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে উন্মোচিত পথসমূহের দিক দিয়া, এবং সে তাহার চেষ্টা-প্রয়াসের দ্বারা খোদাতা'লার প্রীতি লাভ করিতে পারে সেই প্রত্যাশিত ঐশী-প্রীতির দিক দিয়াও।

ان العزة لله جميعا

প্রকৃত ইজ্জত ও সম্ভ্রম তো উহাই, যাহা কেহ তাহার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে লাভ করে। এই জগতে আল্লাহ্‌তা'লা বহুবিধ পার্থিব ও অপার্থিব উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেগুলির দ্বারা সম্মান-সম্ভ্রমমূলক অধিকারসমূহ নিরূপিত হয়। সেই যাবতীয় উপকরণ প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য। কাহারো প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না, ঘৃণা তাচ্ছিল্য-সূচক কথা কাহাকেও বলিবে না, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সুলভ ব্যবহার করিবে না, নিজেকে বড় বলিয়া জ্ঞান করিবে না, কাহারো বিরুদ্ধে অহংকার ও অহমিকা প্রদর্শন করিবে না।

তারপর পারস্পরিক আমানত প্রসঙ্গে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হক্ বা ন্যায্য অধিকার কায়েম করা হইয়াছে তাহা হইল মজুরী বা পারিশ্রমিক সংক্রান্ত হক্ ও অধিকার। এক ব্যক্তি তাহার সময় ও শ্রম অন্যকে দান করে এবং তাহার এই সময় ও শ্রমের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি তাহাকে যে প্রতিদান বা পারিশ্রমিকের অঙ্গীকার দান করে—এরূপ অঙ্গীকার বা Understanding-এর ফল-শ্রুতিতে সেই পারিশ্রমিক বা প্রতিদান তাহার নিকট গচ্ছিত আমানত স্বরূপ হইয়া যায়। এই সকল আমানত অনেক সময় পড়িয়া থাকে। অথবা পারিশ্রমিকের কিছু অংশ মজুরদিগকে বৎসরে একবার অথবা দুইবার অধুনা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বোনাসের আকারে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত উহা তাহারা না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা আমানত স্বরূপ সেই লিমিটেড কোম্পানী বা অন্য কোন পুঁজী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থাকিয়া যায়।

তারপর যোগ্যতা সংক্রান্ত হক্ ও অধিকার আছে। খোদাতা'লা প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সে পুরুষ হউক অথবা স্ত্রীলোক, বহু প্রকারের শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়া এ জগতে পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য হক্ তাহার পাওয়া উচিত। ইহা তাহার আমানত বিশেষ। কুরআন করীম এক স্থানে বলিয়াছে যে 'যাহারা নিজ যোগ্যতার গুণে যোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাদের প্রাপ্য আমানতসমূহ তাহাদিগকে দান কর।'

চতুর্থতঃ আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, 'খিয়ানতকারীদের পক্ষ সমর্থন করিও না।' আল্লাহ্ তা'লার এই হুকুম অমান্য করিয়া, 'খিয়ানতকারীদিগকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিয়া, তাহাদের উকিল বনিয়া, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া জগতে এত ফাসাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে যে, মানবীয় বুদ্ধি উহার অপরিসীম শক্তির পরিধি অনুমানও করিতে পারে না। আর যুলুম ও অত্যাচারের এই হিংস্র খেলা দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে; কোথাও কম আর কোথাও বেশী। যদি মানুষ দৃঢ়রূপে এই নীতিটি অবলম্বন করে যে, যেহেতু আমরা কোন অবস্থাতে খিয়ানত করিব না সেইহেতু আমরা কোন অবস্থাতেই খিয়ানতকারীর পক্ষ সমর্থনও করিব না, তাহা হইলে বিশ্বে সামাজিক পরিমণ্ডল সুধরাইয়া উহার বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা এক কোটি

গুণ বরং এক অর্বুদগুণ অধিক সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। বস্তুতঃ মানুষের সম্মুখে সৌন্দর্য তো একমাত্র ইসলামী শিক্ষাতেই পেশ করা হইয়াছে কিন্তু তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ এবং সংকোচ বোধ করিতেছে।

পঞ্চমতঃ, আমাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা জানাইয়াছেন যে, তিনি খিয়ানতকারীকে তাঁহার প্রীতি লাভে বঞ্চিত রাখেন। আর যেমন কিনা আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, খিয়ানতকারীর পক্ষ সমর্থনকারীকেও আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি ও ভালবাসা, তাঁহার নেয়ামত ও অনুগ্রহ এবং তাঁহার পক্ষ হইতে প্রদত্ত ঐশী সম্মান ও ইজ্জত হইতে বঞ্চিত করা হয়।

আর যেহেতু খিয়ানতকারীকে খোদাতা'লার প্রেম হইতে বঞ্চিত করা হয়, সেহেতু সে তাহার তদ্বির ও কৌশলে বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। খিয়ানতকারী যে উদ্দেশ্য লাভের মতলবে খিয়ানত করিয়া থাকে প্রকৃত অর্থে সেই উদ্দেশ্য সে লাভ করিতে পারে না। যেমন, চোরও এক প্রকার খিয়ানতকারী। সে অন্যের গৃহে ঢোকে এবং অন্যায়ভাবে অন্যের ধন-সম্পদের উপর ডাকাতি চালাইয়া তাহা লুণ্ঠন করে। তাহার না কোন ইজ্জত, আর না কোন ধন-সম্পদে বরকত হয়। কোটি কোটি টাকার সম্পদ অপহরণকারীকেও ফকিরের চাইতেও অধম অবস্থায় নোংরা পোষাকে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা যায়। তদুপরি সর্বক্ষণ আতঙ্কে তাহার ভিতরটা কাঁপিতে থাকে। বোধ হয়, খোদার ভয়ে এরূপ ব্যক্তিদের অন্তর কাঁপে না, কিন্তু মানুষের ভয়ে কম্পমান হয়। ভিতর হইতে বিবেক তাহাকে দংশন করিতে থাকে, 'হায় হায় তুই কি করিয়াছিস ?!' আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, সে প্রকৃত সফলতায় ভূষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। সে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য হয়।

এইরূপ অনেকগুলি কথা আমি উল্লিখিত আয়াতসমূহ হইতে বাহির করিয়া আপনাদের সামনে পেশ করিলাম। কুরআন শরীফের কোন একটি হুকুমের অধীনেও (দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে) মুমেন ও কাফেরের মধ্যে মানুষ হিসাবে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ করা হয় নাই। ইহা বলা হয় নাই যে, একজন মুমেনের প্রতি তো আল্লাহ্‌র নির্দেশ এই যে, সে আল্লাহ্‌র খিয়ানত করিবে না। কিন্তু কাফেরকে আল্লাহ্‌ বলিতেছেন যে, 'তুমি অবশ্য খিয়ানত করিতে পার কিন্তু তোমাকে পাকড়াও করা হইবে না!' এখানে ইহা বলা হয় নাই যে, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শুধু মুমেনদের জন্য 'উসওয়া'—'আদর্শ নমুনা।' যদি তাঁহার রেসালত ও আবির্ভাব كافة للناس 'সমগ্র মানব মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে' হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মাকাম ও মর্যাদা 'উসওয়া' হিসাবেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর উদ্দেশ্যেই প্রতীয়মান হয়; উহা কোন শ্রেণী বিশেষের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত নয়। তেমনি এখানে ইহা বলা হয় নাই যে, 'মুসলমানের ধন-সম্পদের মধ্যে খিয়ানত করিবে না, অমুসলিমের ধন-সম্পদে খিয়ানত করিয়া বেড়াও, তুমি ধৃত হইবে না।' বরং বলা হইয়াছে যে, 'মুমেন ও কাফের নির্বিশেষে কাহারও ধন-সম্পদে খিয়ানত করিবে না।'

প্রাণ বা জীবন সম্পর্কিত ইসলাম নির্দেশিত হক্ ও অধিকারসমূহ আমি বর্ণনা করিয়াছি। ইহা বলা হয় নাই যে, 'মুসলমানের প্রাণ নাশ করিও না, বিনা অধিকারে অমুসলিমের প্রাণ নাশ করিতে পার!' অধিকার তো শুধু প্রতিষ্ঠিত সরকারকে (উহার বিচার বিভাগের মাধ্যমে) দেওয়া হইয়াছে অথবা কিসাস'-এর মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে, যদি এতদসংক্রান্ত ইসলামী বিধান প্রবর্তিত ও প্রচলিত থাকে। তেমনি ইহা বলা হয় নাই যে, 'মুসলমানের জীবনকে দুঃখ-দুর্দশায় ভারাক্রান্ত করিবে না, অমুসলিমকে সর্বদা দুঃখ যাতনা দিতে থাকিবে!' আদৌ এরূপ বলা হয় নাই বরং বলা হইয়াছে যে, মুসলিম হউন অথবা অমুসলিম, (তোমাদের জন্য কুরআন শরীফে সবিস্তারে বর্ণিত) তোমাদিগকে পারস্পরিক আমানতসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও হক্‌দারকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে; সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান রাখে কি রাখে না তাহা এক্ষেত্রে কাহারও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে না।

সম্মান-সম্ভ্রম সংক্রান্ত হক্ ও অধিকার প্রসঙ্গে মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা হয় নাই যে, শুধু 'মুসলমানের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত দিও না।" বরং আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন যে, শেরক (অংশীবাদিতা ও প্রতীমা পূজা) যদিও সর্বাপেক্ষা বড় যুলুম এবং পাপ, তথাপি একজন মোশরেকের আবেগ-অনুভূতিতেও তোমার কোন কথার দ্বারা আঘাত দিবে না।

لاتسبوا الذين يدعون من دون الله (الانعام: ١٠٩)

ইহা বলা হয় নাই যে, 'যদি মজুর মুসলমান হয় তাহা হইলে তাহাকে মজুরীর ন্যায্য হক দান কর; যদি অমুসলিম হয় তাহা হইলে করিও না!' বরং বলা হইয়াছে, 'মুসলিম বা অমুসলিম, মুমেন বা কাফের, তৌহীদবাদী, বা অংশীবাদী—কেহ যে কোন আকীদা বা ধ্যান-ধারণার অনুসারী হউক, সে যতটুকু কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী যাহা তাহার হক সাব্যস্ত হয়, উহা তোমার নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত, তাহার সেই হক্ তাহাকে দান কর, তাহার মজুরী তাহাকে দাও এবং যথাসময়ে দাও।

ইহা বলা হয় নাই যে, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার দিক দিয়া যে ন্যায্য অধিকার বা হক্ কায়েম হয় তাহা মুসলমানের হইলে তাহাকে দাও; আর অমুসলিমের ক্ষেত্রে খোদাতা'লার উপর দোষারোপ কর যে, 'তিনি কেন তাহাদিগকে (অমুসলিমকে) যোগ্যতায় ভূষিত করিলেন? এরূপ করিয়া আল্লাহ্ ভুল করিয়াছেন, আমরা উহার সংশোধন করিতেছি'। (নাউযুবিল্লাহ)। বরং কুরআন শরীফ বলিয়াছে, 'যাহাকে খোদাতা'লা তাঁহার ফযলের দ্বারা, তাঁহার রবুবিয়তের ফলশ্রুতিতে এবং রহমানীয়তের জ্যোতির্বিকাশের দ্বারা (আল্লাহ্‌র রবুবিয়ত ও রহমানিয়ত মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ করে না) যে যোগ্যতা দান করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র সেই প্রদত্ত যোগ্যতার ন্যায্য হক্ তাহাকে প্রদান কর এবং যোগ্যকে তাহার আমানত প্রত্যার্পণ কর। খিয়ানতকারী মুসলিমও হইতে পারে এবং অমুসলিমও।

কুরআন শরীফ ইহা বলে নাই যে, খিয়ানকারী অমুসলিম হইলে তাহার পক্ষ সমর্থন করিও না কিন্তু মুসলিম হইলে তাহার পক্ষ সমর্থন করিও। বরং আল্লাহ্ বলিয়াছেন, খিয়ানতকারী মুসলিম হউক অথবা অমুসলিম হউক এরূপ কাহারও পক্ষ সমর্থন করিবে না। আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করিয়াছেন যে, খিয়ানতকারীকে তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করা হইবে। ইহা বলেন নাই যে, সে মুসলমান হইলে তাহাকে তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। তেমনি খোদাতা'লা বলিয়াছেন, খিয়ানতকারী তাহার চেষ্টা-প্রয়াস ও কৌশলের ক্ষেত্রে প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। ইহা বলেন নাই যে, সে কাফের হইলে প্রকৃত ও সত্যিকার কৃতকার্যতা অর্জন করিতে পারিবে না; আর সে মুমেন হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। এরূপ কখনও বলেন নাই; বরং মুমেন ও কাফের উভয়কে একই স্তরে আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। উভয়ের হক্ ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে এবং মুসলিম ও অমুসলিমের কোন ভেদাভেদ করা হয় নাই। যেমন আমি বলিয়াছি, তৌহীদের অনুসারী এবং অংশীবাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। কোন মুসলমান ইহা বলিতে পারে না যে, 'যেহেতু সে মুশরেক সেজন্য তাহার হক্ আমরা নষ্ট করিয়া দিব' এরূপ বলার বা করার কোন অধিকার নাই। ঠিক তেমনি, হক্ নষ্ট করার অধিকার কোন মুসলমানকেও দেওয়া হয় নাই, যেমন কোন মুসলমানের এরূপ করার হক বর্তায় না। ('আল-ফযল' ১১ই আগষ্ট ১৯৮০)

(১৬ পাতার পর)

ছিল। ক্ষণিক পূর্বেই যাদের অন্যায় আঘাতে তিনি জীবন হারাতে যাচ্ছিলেন, তাদের জন্যই আল্লাহ্‌র দরবারে এমন আকুতি। তার নিজের কথা, সাহাবাদের কথা, শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার কথা তিনি ভাবছেন না; তিনি তখন ভাবছেন: আল্লাহ্‌র রসূলের উপর এরূপ অকথ্য অত্যাচার করায়, খোদার গযব যেন ওদের উপর পতিত না হয়।

মক্কা বিজয়ের কথা স্মরণ করুন। মক্কা অধিকার করে, মক্কাবাসীদের এবং কোরেশদের লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ্ বল্লেন, "কোরেশগণ, আজ তোমরা কী ভাবছ?"

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা উত্তর দেয়, "ভাবছি আমাদের অদৃষ্টের কথা। ভাবছি তোমার উপর দীর্ঘকাল যে, অত্যাচার করেছি আজ তার কী প্রতিফল দেবে, সেই কথা।"

খোদার প্রিয় নবী সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারী—তিনি প্রতিশোধের কথা ভাবতেই পারেন না। বিজয়ের দিনে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। কারো বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন অভিমান। আদর্শ হারা দিশেহারা মানুষের জন্য হৃদয়ে তাঁর ঢেউ উঠছে। দীনের নবী হাসিমুখে বল্লেন, "আজ তোমাদের উপর আমার কোনই অভিযোগ নেই। অপরাধ তোমাদের মাফ করা হলো। তোমরা সব মুক্ত স্বাধীন।"

দুনিয়াতে আবার ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আমাদের জন্য কোন সোজা পথ নেই। ফাঁকি দিয়ে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় না, একথা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। রসূলুল্লাহ্‌র আখলাক ছিল ইসলামী আদর্শের প্রাণ-স্বরূপ। আর এই প্রাণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, তাঁর জীবন-চরিত থেকে নতুন করে খোদা-প্রেম ও মানব-প্রেমের সবক নিতে হবে। বাস্তবে কাজে লাগাতে হবে।

(মাহে নও এর সৌজন্যে, আগষ্ট, ১৯৬৩ সংখ্যা থেকে পুনঃ প্রকাশিত)

মোস্তফা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর

কোন নবী-রসূলের শিক্ষাকে বিচার করতে গিয়ে শুধু দার্শনিক কষ্টি-পাথরের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। এজন্য বরং বিচার করে দেখা একান্ত প্রয়োজন যে, তিনি নিজের জীবনে উক্ত শিক্ষাকে কিভাবে এবং কতটুকু প্রতিফলিত করেছেন। কারণ নবীর শিক্ষা হলো একটি আদর্শ (Ideal), আর তাঁর জীবন হলো ঐ শিক্ষার একটি নমুনা (Model)। সেই নমুনা দিয়েই আমরা সম্যক ধারণা করতে পারি তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভবপর কি না এবং সম্ভবপর হলে, তদ্বারা অনুগামীদের স্বভাব-চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ধারণ করবে। তাই কুরআনের শিক্ষার বিচার করতে হবে, রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনকেও তারই পরিপেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রসূল-চরিত্রের খোদা-প্রেম ও মানবতা-বোধ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অসামান্য জীবন নিয়ে আলোচনা করলে সবচেয়ে যে বিষয়টি বড় ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো আল্লাহ্‌র উপর তাঁর অটল বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা। জীবনের কোন মুহূর্তেই তাঁর খোদা-প্রেমে এতটুকু ফাটল ধরেনি। জীবনের চরম সঙ্কটকালে তিনি যেমন আল্লাহ্‌তে পূর্ণ আস্থা রেখেছেন, তেমনি আবার ধন-দৌলত, লোভ-লালসার আহ্বান বা বিজয়ের চরম উল্লাসও তাঁকে উক্ত বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাঁর জীবন থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মক্কাবাসীদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা ও অত্যাচার উৎপীড়ন যখন রসূলুল্লাহ্‌কে ইসলামের আদর্শ প্রচার থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তাঁরা তাঁকে ধন দৌলত, সুন্দরী নারী ও জাতির নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব দানের লোভ দেখিয়ে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা শুরু করলো। রসূলুল্লাহ্‌র মনের কোণে যদি ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও বিলাসিতা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় থাকতো তবে নিশ্চয়ই তিনি এই আহ্বানকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতেন।

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার ব্যাপারটি রসূলে করীমের জীবনে একটি অত্যুজ্জ্বল ঐশী-প্রেমের উদাহরণ।

জন্ম স্থান সবার নিকটই অতি প্রিয়। এর প্রতি ধূলিকণার সাথে শৈশব ও কৈশোরের হাসি-কান্না, খেলাধূলা, যৌবনের রঙিন স্বপ্ন ও কর্ম-জীবনের ধ্যান-ধারণার স্মৃতি বিজড়িত। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে হযরতের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না; ছিল না কোনো প্রতিশোধ নেবার বাসনা। তিনি তাদের মংগল চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন এবং স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে সেই প্রিয় জন্মভূমিও ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না তিনি।

মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র যখন চরমে উঠলো, তাঁর জীবন নাশের উদ্দেশ্যে সময় নির্দিষ্ট করে তারা যখন সংকল্প গ্রহণ করলো, তখন তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে গভীর রাত্রে মদীনার পথে যাত্রা করলেন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে নিয়ে সওর গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কোরেশগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। কয়েকজন শত্রু উক্ত গুহার অতি নিকটেই সমুপস্থিত। এমন কি তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছিল। আবুবকর বিচলিত হয়ে ওঠলেন। তিনি হযরতকে বললেন, "শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, আর আমরা মাত্র দু'জন; কি হবে।"

হযরত শান্তকণ্ঠে বললেন,—"আবু বকর, আপনি ভুল করেছেন, আমরা দু'জন নই—আরো একজন আছেন সাথে—আমাদের আল্লাহ্‌ রয়েছেন।"

এই কথোপকথনটি সেই সময়কার ঘটনাবলীর মাধ্যমে রসূল করীম (সাঃ) যে আল্লাহ্‌ তা'লার উপর কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন ও জীবন-পথে সর্বক্ষণ স্রষ্টাকে স্মরণ রাখতেন, তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লা যে কোন বিপদ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করতে পারেন, সন্দেহাতীতভাবে তাঁর জীবনাচরণে তিনি তাও প্রমাণিত করলেন। স্রষ্টার সাথে দৃঢ় সংযোগ ঘটলে, জাগতিক দৃষ্টিতে নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় পরম শত্রু কবলে পড়েও মানুষ কত শান্ত ও নির্বিকার হতে পারে, সহজ সরল ভাবে যে কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে, সে বিষয়ে রসূলে-খোদা উম্মতদের জন্য জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

একদা কোন বেদুঈন হযরতের পথ আগলে তলোয়ার উঁচিয়ে হাঁক ছেড়ে বল্লো,—"মুহাম্মদ, বলো, কে তোমাকে রক্ষা করবে?"

এখানে কেউ তাঁর সহায় নেই, 'মাকড়সার জাল' বোনারও সুযোগ নেই। নিমিষেই শত্রুর তলোয়ারে শির খণ্ডিত হয়ে পড়বে। একটি কথাই শুধু এখন তাঁর এই সমস্যার সমাধান করতে পারে: এখন তাঁর হত্যাকারীই তাঁর প্রাণ রক্ষাকারী। সে ছাড়া আর কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। এই কঠিন সময়ে তাঁর ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেল। খোদার রসূল দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—"আল্লাহ্‌ রক্ষা করবেন।" শত্রুর তরবারী হস্তচ্যুত হয়ে পড়ল।

ওহুদের যুদ্ধ। সাময়িকভাবে মুসলমানদের পরাজয় ঘটছে। সাহাবাগণ ছত্রভংগ হয়ে পড়েছেন। রসূলুল্লাহ্‌ আহত। তাঁর পবিত্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত। সম্মুখের চারটি দাঁত বিনষ্ট। খোদার রসূল মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর তিনি চেতনা ফিরে পেলেন।

শত্রুরা বিজয়-উল্লাসে মাতোয়ারা। দম্ভোক্তি করে তারা প্রধান প্রধান সাহাবা ও রসূলুল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাঁদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। সাহাবাগণ তার জবাব দিতে উদ্যত হলেন, রসূলুল্লাহ্‌ তাঁদের বারণ করলেন। এদিকে শত্রুরা তাদের দেবতা হুবলের জয় ধ্বনি করে বলে উঠলো, "হুবলের নিকট মুহাম্মদের খোদার পরাজয় ঘটেছে।" এবার রসূলুল্লাহ্‌ সবাইকে তাগিদ দিয়ে বললেন,—"এখন তোমরা বসে আছ কেন?" সাথে সাথে মুসলমানগণ 'আল্লাহ্‌ আকবর' ধ্বনি তুল্লেন। আল্লাহ্‌র অপমান তিনি কোনো অবস্থাতেই বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ইসলামের আগমন। তাঁর জয়ধ্বনি করাই মুমিনের জিন্দেগীর পরম ও চরম লক্ষ্য। খোদার রসূল যুদ্ধক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও আমাদের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে রসূলে করীম (সাঃ) যে নামাযে আল্লাহ্‌র যিকর ও ধ্যান-ধারণায় গভীর ভাবে মগ্ন থাকতেন, আল্লাহ্‌র নামে সব কাজ আরম্ভ করতেন, কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌রই শুকরগুযারী করতেন — এ সব বিষয় এখানে না উল্লেখ করলেও চলে।

খোদা প্রেমে যেমন রসূলুল্লাহ ছিলেন অতুলনীয় ও পরিপূর্ণ, তেমনি ছিলেন মানব-প্রেমে। বস্তুতঃ তিনি যদি খোদা-প্রেমে বিভোর হয়ে বাস্তব জগৎ থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন, তবে বোধ হয় জীবনে তাঁকে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হত না। বস্তুতঃ সর্বকালে সর্বযুগে মানুষকে 'সুন্দর' করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর বাগান সুষমায় ভরে দেয়ার জন্য রসূলে করীমের বিরামহীন চেষ্টার দরুণই তাঁকে পদে পদে দুঃখ-দুর্ভোগ বরণ করতে হয়েছিল।

মানুষ তার মঙ্গলাকাঙ্খীর প্রতি অত্যাচার অবিচার করে ইতিহাসকে যেভাবে কলংকিত করেছে বোধ হয়, সে শত্রুর উপরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তেমন উদাহরণ সৃষ্টি করেনি। হযরত ছিলেন মানুষের সব চেয়ে বড় কল্যাণকামী, আর তাঁর উপরেই হয়েছে ইতিহাসের সব চেয়ে বেশী যুলুম।

এক বৃদ্ধা হযরতের মতামত পসন্দ করতো না এবং সেই আক্রোশে তাঁর যাবার পথে সে প্রতিদিন কাঁটা ফেলে রাখতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটলো। রসূলে করীম লক্ষ্য করলেন, সেই বুড়ীতো এখন পথে কাঁটা ফেলে রাখছে না। তিনি ভাবলেন, বৃদ্ধার নিশ্চয়ই অসুখ বিসুখ করেছে। যদি তাই হয়, আহা! তবে তো এই বয়সে তার সেবা শুশ্রূষার দরকার। খোদার হাবিব উদ্বিগ্ন চিত্তে বৃদ্ধার বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মা, তোমার কোন সেবায় আমি লাগতে পারি?'

হযরত ওমরের এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় রসূলুল্লাহ্‌ তাঁকে বারণ করছেন, "মেরো না ওকে মেরো না! মসজিদ ধুয়ে দিলেই সাফ হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে। মসজিদে প্রস্রাব করার দরুণ যদি বেদুঈনকে প্রহার করো, তাতে তার স্বাস্থ্যের এমন ক্ষতি হতে পারে যা আর কখনও সারবে না।"

সেই বেদুঈন লোকটি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাব করে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। হযরত ওমর তাকে শাস্তি দান করে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খোদার হাবিব অন্যভাবে শিক্ষা দিলেন। মসজিদের চেয়ে তাঁর নিকট ছিল মানুষ বড়।

ওহুদ-রণক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্‌ কাতর ভাবে হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করছেন, "হে পরওয়ারদিগার, যারা তাদের মঙ্গলাকাঙ্খী নবীকে এমনভাবে আঘাত হানতে পারে, তারা কি করে জগতে উন্নতি করবে? হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা করো। তারা অজ্ঞ—তারা ভ্রান্ত।"

পূর্বে উল্লেখ করেছি, ওহুদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্‌ মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তিনি তাঁর জাতির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠিয়ে উপরোক্ত দোয়া করেন। এতে বুঝা যায়, নবী করীমের মানবতাবোধ কী গভীর ও অতুলনীয়

(অবশিষ্টাংশ ১৩ পাতায় দেখুন)

রসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর জীবনে বিবাহ

মকবুল আহমদ খান

আবহমান কাল থেকেই মানব-সমাজে বিবাহ প্রথা চলে আসছে। বিবাহ সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, যা সমাজ-জীবনকে সরস, সুস্থ, ও সবল অবস্থায় সচল রাখে। বিবাহ প্রথার অনুপস্থিতিতে মানব জীবন ও পশুর জীবনে কোন পার্থক্য থাকত কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির তাড়নায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মারামারি কাটা-কাটি করে নিজেদেরই নিশ্চিহ্ন করে দিত।

প্রত্যেকটি বিষয়েই ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হয়। আদিম-বিবাহ-প্রথা ও নিয়ম-পদ্ধতিতেও ক্রমাগত ভাবেই উন্নতি সাধিত হয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবে, বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহার ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য এবং প্রথা-পদ্ধতি সহ ইহার সকল দিকেই চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে।

ইসলামের নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিশুকাল থেকেই অতি পবিত্র-চিত্ত ছিলেন। কোন ধরণের কলুষ বা কালিমা তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কোন অধ্যায়কেই কোনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। মক্কার গর্বিত মানুষের চোখের সামনে যে অনাথ-এতীম শিশুটি শৈশব পেরিয়ে যৌবনে এলেন, তাঁর পূত-পুণ্য-পবিত্র জীবনের মধ্যে তারা এমনি আকর্ষণীয় ও অস্বাভাবিক গুণাবলীর সমাবেশ দেখলেন যে, তারা তাঁকে তাঁর যৌবনেই 'আল-আমীন' উপাধিতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ভূষিত করলো। সত্যের প্রতি প্রবলতম নিষ্ঠা ও পরোপকারের দুর্নিবার বাসনা, দয়া-মায়া-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা তাঁর দেহ-মন ও আত্মাকে একেবারে আপ্লুত করে রেখেছিল। সমসাময়িকদের মন হতে স্বতঃ উৎসারিত এ দুর্লভ খেতাব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যৌবনকালীন চরিত্রের পুণ্যমুখিতা ও পবিত্রতা সহ শতমুখী গুণাবলীকে এক কথায় চিত্রিত করে রেখেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এসব অনুপম গুণাবলীর কথা মক্কার এক ধনাঢ্য বণিক রমণীর কর্ণে পৌঁছল। তাঁর নাম ছিল খাদীজা। তিনি তাঁকে নিজের বাণিজ্য বহরের নেতা করে সিরিয়া পাঠাতে মনস্থ করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর চাচার নিকট প্রস্তাব পাঠালেন। নবী করীমের বয়স তখন প্রায় পঁচিশ বৎসর। চাচা তাঁকে একথা জানালে, তিনি তাতে সম্মত হলেন। খাদীজার বাণিজ্য বহর যখন সিরিয়া হতে ফিরে এল এবং মুহাম্মদ (সাঃ) খাদীজাকে হিসাব-নিকাষ বুঝিয়ে দিলেন, তখন খাদীজা ইহা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন যে, ইতিপূর্বেকার কোন বাণিজ্য যাত্রায় তো এত লাভ কখনও হয় নি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত দাস মাইসারাকে, যে এই বাণিজ্য যাত্রায় নবীজীর সাথী ও সহকারী ছিল জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বাজার দর কিছুটা পক্ষে থাকায় এ সফলতা কিছুটা দায়ী হলেও, আসলে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দক্ষতা, সততা, প্রচেষ্টা ও ক্রেতাগণের সাথে তাঁর

আকর্ষণীয় বিনয়-ব্যবহারের জন্যই সাকল্যভাবে এ যাত্রার বাণিজ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। মাইসারার মুখে এত প্রশংসা শুনে খাদীজার মনের মণিকোঠায় ভাবান্তর উপস্থিত হল। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে মনস্থির করলেন। তিনি পূর্বে দু'বার বিধবা হয়েছেন। তাঁর বয়সও তখন চল্লিশ বৎসর। তবুও তাঁর একজন বিশ্বস্ত দাসীকে দিয়ে নবীজীর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। দাসী এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার তো বিবাহের বয়স হয়েছে,, বিবাহ করছেন না কেন?' উত্তরে মহানবী (সাঃ) বললেন, 'আমিতো গরীব, আমাকে বিয়ে করবে কে? আর আমিই বা এ দায়িত্ব বহন করব কি ভাবে?' দাসী বলল, 'সে-ই সব ব্যবস্থা করে দিবে।' রসূলুল্লাহ (সাঃ) আভাষে কিছু বুঝতে পারলেন এবং তাঁর অভিভাবক চাচা আবু তালেবের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করতে সম্মতি দিলেন।

এভাবে ধনী খাদীজার সাথে তাঁর (সাঃ) বিবাহ হয়ে গেল। তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ ও দাস-দাসীকে স্বামীর হাতে স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তুলে দিলেন। মানবতাবাদী মুহাম্মদ খাদীজার সাথে পরামর্শক্রমে ঐ ধন সম্পদের কিয়দাংশ নিজেদের জীবন যাপনের জন্য রেখে, বাকী সবটাই দীন-দরিদ্রের মাঝে উদার হস্তে বিলিয়ে দিলেন এবং সকল ক্রীতদাস-দাসীকে স্বাধীন ও মুক্ত করে দিলেন। এই মহানুভবতার কাজে মহামতী খাদীজাও তাকে সানন্দে সহযোগিতা করলেন। এরপর দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার মাঝে তাঁদের বিবাহিত জীবন কাটালেন। কত বড় ঝঞ্ঝা ও চড়াই উৎরাই যে তাঁরা পার হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের মধুর দাম্পত্য জীবনে ক্ষণিকের তরেও চির ধরেনি। মহিয়সী মহিলা খাদীজা স্বামীর সাথে আজীবন ছায়ার মত থেকে তাঁকে প্রাণ পণে সাহায্য করেছেন, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন সহধর্মিণী। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্য ও অসীম মানব দরদ খাদীজাকে বিমোহিত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই দেখি, মহানবী (সাঃ) যখন হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় আল্লাহ্‌র তরফ হতে বাণী প্রাপ্ত হলেন এবং সর্বপ্রথম একথা খাদীজার কাছে উদ্বিগ্ন মনে প্রকাশ করলেন, তখন উম্মুল মুমেনীন খাদীজা (রাঃ) তাঁকে অভয় দিয়ে বল্লেন, "যে আল্লাহ্‌ তাঁর এমন সুমহান বাণী দ্বারা আপনাকে ভূষিত করেছেন, তিনি নিশ্চয় আপনাকে কৃতকার্য করবেন। তিনি কখনও আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। কেননা আপনি মানব হিতৈষী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়ালু ও বিবেচনাশীল, দরিদ্র ও পতিতদের সাহায্যকারী এবং তাদের বোঝা বহনকারী। আপনি আমাদের দেশে অপসৃত পুণ্যময় গুণাবলীর পুনরুদ্ধারের মহান ব্রতে আত্ম নিয়োজিত। আপনি অতিথির সম্মান করেন এবং দুঃখীর দুঃখ মোচনে ব্যাপৃত থাকেন। আল্লাহ্‌ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না আপনি অকৃতকার্য ও অযোগ্য হতে পারেন না।" প্রিয়তমা খাদীজার সেদিনকার এ উৎসাহব্যঞ্জক সত্যকথন মহানবীর জীবন ভর সংগ্রামে আলোক বর্তিকার মত কাজ করেছে এবং সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ২৫ বৎসর কাল তাঁর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। এর মধ্যে মহানবী (সাঃ) আরবদের প্রথার বিপরীতে অন্য কোন স্ত্রীর

কথা ক্ষণিকের তরেও ভাবেন নি। এতে বুঝা যায় বিবাহের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সাধারণ ভাবে ইহাই ছিল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের এক স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

কিন্তু জাগতিক জীবনে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের বিশেষ প্রয়োজনে ও সামাজিক চাহিদার কারণে এবং দেশ-হিতৈষণার তাকিদে অনেক সময় বহু-বিবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমন কি, বহু বিবাহ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বহু-বিবাহের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজ ও জাতি পাপের পঙ্কিলে নিমগ্ন হয়ে, সামাজিক শৃঙ্খলা হারিয়ে, সম্পূর্ণ উৎসন্ন হয়ে যেতে পারে। এখানে সেরূপ কয়েকটি অবস্থার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি বিবাহের বহুবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (ক) দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকার হতে আত্মরক্ষা, (খ) প্রশান্তি অর্জন ও প্রীতিময়ী সঙ্গী লাভ, (গ) সন্তান লাভ ও বংশ রক্ষা, (ঘ) আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্প্রসারণ। উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অনেক ক্ষেত্রে একই স্ত্রীর মাধ্যমে অর্জিত হয় না। যেমন, একমাত্র স্ত্রী যদি কোন কারণে স্থায়ীভাবে শক্তিহীনা ও অকর্মণ্যা বা পঙ্গু হয়ে পড়ে, কিংবা কোন দুরারোগ্য ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ ব্যতীত কোন অবস্থায়ই উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর পূরণ করতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য বিবাহ করার যদি কোন পথ না থাকে বা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে হতভাগ্য স্বামীকে চিরকাল প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অসম সংগ্রাম করে যেতে হবে, নতুবা জৈব তাড়নার পীড়ন সহ্য করতে না পেরে নৈতিক অধঃপতনের শিকার হতে হবে। চির রুগ্ন স্ত্রী কখনও তার স্বামীকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম নয়। স্বামীর পক্ষেও উচিত হবে না যে, অনাহূত রোগের কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় অপর স্ত্রী-গ্রহণই উত্তম পন্থা। এমনও হতে পারে, একমাত্র স্ত্রী সবদিক দিয়েই সন্তোষজনক, কিন্তু স্বামীকে সন্তান দানে অক্ষম। চেষ্টা তদ্‌বীরের পরও তার সন্তান-সম্ভাবনা হওয়ার আশা নেই। এমতাবস্থায় স্বামীর পক্ষে তাকে তালাক দেয়া কি ভাল কাজ হবে? নিশ্চয় না। অতএব, স্বামী যদি সন্তান লাভের জন্য অন্য বিবাহ করে এবং অসন্তানবতী পূর্ব স্ত্রীকে সম্মানে নিজের কাছে স্ত্রী হিসেবে রাখে, তাহলে সেটা কি অধিকতর শোভনীয় নয় এবং ন্যায় বিচারের অধিকতর কাছাকাছি নয়? এ সব অবস্থাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে, ইসলামের অনুমোদিত বহু-বিবাহ শুধু ন্যায়-ভিত্তিকই নহে, বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে হয়। 'একই বিবাহ, বহু নহে'—একথা যেমন সম্পূর্ণ প্রকৃতি সম্মত নয়, তেমনি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যও নয়। তাই ইসলাম 'এক স্বামী—এক স্ত্রী'র সাধারণ সামাজিক নিয়মকে গ্রহণ করা সত্বেও, প্রয়োজন বোধে শর্তসাপেক্ষে বহু-বিবাহের পথও খোলা রেখেছে। বহু-বিবাহের অনুমতি থাকলেও সেটাই রীতি বা নিয়ম নয়। ব্যক্তি ও সমাজের সম-সাময়িক প্রেক্ষাপটে ইহার প্রয়োগ ক্ষেত্র আসে। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বোচ্চ চার স্ত্রী

একই সময়ে রাখার অনুমতি সূরা নেসার ৪নং আয়াতে রয়েছে। আর ঐ আয়াতটি নাযেল হয়েছিল 'এতীম' ছেলে-মেয়েদের স্বার্থ, সম্পত্তি সংরক্ষণ, তাদের ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বাবলী পালন সম্বন্ধে। ঐ সকল এতীমদের বিধবা মাতাগণকে বিবাহ করার দ্বারা তাদের স্বার্থ ও অভিভাবকত্ব নিশ্চিত হতে পারে এবং অসহায়ত্ব দূর হতে পারে। এতীম অসহায় দরিদ্র বালিকাদিগকে কেউ বিবাহ করতে আগ্রহী হয় না। আর সেই বেচারীরা পূর্ণ যৌবনা হয়েও যদি স্বামী না পায়, তাহলে সমাজের নৈতিক পতনের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। আজ আমরা স্বচক্ষে দেখছি যে, অসামাজিক কার্যকলাপ ভীষণ গতি লাভ করেছে। গরীব মেয়েরা স্বামীরূপ অবলম্বন না পেয়ে দিশেহারা হয়ে অজানা পথে পা বাড়ায়। অতি সহজেই অপরের লোভের শিকারে পরিণত হয়ে নিপীড়িতা, নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা ও দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য হয়। সতীনের জীবন যাপন এ নরকীয় জীবন থেকে শত গুণে শ্রেয়ঃ নয় কি? অতএব, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বিধায়, ইসলামী শরীয়তের চিরস্থায়ী বিধানে বহু বিবাহের অনুমতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই রয়েছে। সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী একসাথে রাখার অনুমতি থাকলেও, যে সকল শর্ত সাপেক্ষে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে সেগুলি পালন করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই শর্তগুলি বহু বিবাহ নিরুৎসাহ করে। অনেকে মনে করেন, ক্রীতদাসীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিবাহের কোন প্রয়োজন পড়ে না। এরূপ ধারণা কুরআনের পবিত্র শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিবাহ বহির্ভূত অবস্থায় কারো সাথে কোনরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন মহাপাপ ও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কুরআন ও শরীয়তের ইহাই বিধান; ইহাতে কোন ব্যতিক্রম নেই। 'মিল্‌ক ইয়ামীন' যুদ্ধ বন্দিনী ও ক্রীতদাসীর বেলায়ও প্রথমে মুক্ত করে বিবাহ করার পর, স্ত্রীরূপে ব্যবহার করার নির্দেশ কুরআন দিয়েছে।

গত দু'টি মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় দেখা গেছে, যুদ্ধরত দেশের জনশক্তি ভীষণাকারে কমে গেছে, বিশেষ করে পুরুষের সংখ্যা। এতে বিধবা নারীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন মহা সংকটের সৃষ্টি করল। এরূপ অবস্থা ঘটেছিল আরবদেশে ইসলামের জন্ম লগ্নে। বহু বিবাহের ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এ সংকটের ছোবল থেকে সসম্মানে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল-শ্রুতিতে পশ্চিমা দেশগুলিতে যখন পুরুষের সংখ্যায় ঘাটতি দেখা দিল, বহু বিবাহের অনুপস্থিতে সেখানে দেখা দিল অপবিত্র যৌন অনাচারের পঙ্কিল ব্যাধি, যা থেকে তারা আজ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারেনি, আর কখনও মুক্ত হতে পারবে বলে মনে হয় না। কেননা এ পঙ্কিল পাপের পথকে তারা স্বাভাবিক মনে করে নিয়েছে। যদি তারা আত্মশোধন দ্বারা এ পথ বর্জন না করে এ মনোভাবই তাদেরকে রসাতলে নিয়ে যাবে।

দৈব-দুর্বিপাকে বা অন্য কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যদি জন্ম হার নিতান্তই কমে যায় এবং জাতিসত্তা নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম দেখা দেয়, তখন জন্মসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়

ও অবলম্বন থাকে বহু বিবাহ। তাই বহু বিবাহ প্রথাটাকে কাম-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মনে করার কোন কারণ নেই। সময়োপযোগী এ প্রথার সদ্ব্যবহার মানুষের সংকট বিমোচনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রথার সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হয় এবং দেশ ও সমাজের উপকারার্থে এ আত্মত্যাগ প্রশংসার যোগ্য।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর বহু বিবাহকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী ও সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাঁর ঐ সব বিবাহ ছিল মানব-হিতৈষণা প্রসূত, উন্নত বিবেক-বিবেচনা ও মহানুভবতার ফলশ্রুতি। নবুওয়াতের দায়িত্বাবলী পালনের সাথে ছিল এগুলির নিগূঢ় সম্পর্ক। কিন্তু পশ্চিমা প্রাচ্যবিদেরা হিংসা পরায়ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে অবস্থান করে, এই বিবাহগুলির মধ্যে জৈবিক লিপ্‌সা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তারা একবারও ভেবে দেখেননি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত এমন মহাপবিত্র কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছিলেন যে, সঙ্গী-সাথী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই তাঁর প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলত, 'ঐ যায় পবিত্র মোহাম্মদ'। ভরা যৌবনে তিনি তাঁর চেয়ে পনর বৎসরের জ্যেষ্ঠা বিধবা মহিলা খাদীজাকে বিয়ে করেন। খাদীজা (রাঃ) পয়ষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর। ইতিমধ্যে খাদীজা বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি তাদের দাম্পত্য জীবনের মাধুরিমায় ক্ষণকালের জন্যও সামান্য যতি চিহ্ন পড়েনি। ভরা যৌবনে, বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে যিনি সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির জীবন কাটালেন, অন্য বিবাহের চিন্তাও যার মনে উদয় হল না; তিনি কি কখনও জৈবিক তাড়নার শিকার হতে পারেন? ক্ষুদ্রমনা বিদ্বেষী নিন্দুকেরা ভেবে দেখেন না যে, একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া, তাঁর অন্য সব স্ত্রীই ছিলেন প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা ছিন্ন-মূল নারী। 'হাফ্‌সা'র স্বামী বদরের যুদ্ধে শহীদ হন, খোযায়মার কন্যা যয়নাবের স্বামী মারা যান ওহুদের যুদ্ধে, 'উম্মে সালমা'র পতি ৪র্থ হিজরী সনে প্রাণত্যাগ করেন, আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার স্বামী ষষ্ঠ হিজরীতে আবিসিনিয়াতে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। 'যাওয়ারিয়া' বিধবা হন হিজরী ৫ম সনে, 'সাফিইয়াহ' বিধবা হন হিঃ ৭ম সনে। তিনি উভয়কে বিবাহ করে তাদের গোত্রের সাথে শান্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেন। যাওয়ারিয়াকে বিবাহের মাধ্যমে তিনি বনি মুস্তালিক গোত্রের একশত বন্দী পরিবারের মুক্তি অর্জন করেন। 'মায়মুনাহ' নামের একজন শিক্ষিতা বিধবা নারী, মুসলিম নারীগণকে লিখা-পড়া শিখাতে চাইলেন যদি রসুল করীম তাঁকে বিয়ে করেন। হুযুর (সাঃ) এই মহতী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে বিয়ে করলেন। মুক্ত ক্রীতদাস ও পোষ্যপুত্র যায়েদের পরিত্যক্ত স্ত্রী যয়নাবকে তিনি এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করেন, যাতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষে কোন প্রভেদ নেই; তবে পোষ্য-পুত্র ও স্বজাত পুত্রের মধ্যে (উত্তরাধিকারের ব্যাপারে) প্রভেদ আছে। এ বিবাহের মধ্যে আরও দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। আরবের প্রথানুযায়ী, পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রী কিংবা

তার পরিত্যক্তা বিধবাকে বিয়ে করা পোষ্য-পিতার জন্য অবৈধ ছিল ; এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে এই বিবাহের মাধ্যমে। অপরদিকে, মহানবী (সাঃ)-এর নিকট আত্মীয় অভিজাত রমণী যয়নাবের মনে একটা ক্ষত ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিভাবক হিসেবে তাকে একজন অজ্ঞাতকুলের ক্রীতদাসের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। যায়েদ যখন যয়নাবের সাথে স্বীয় বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটালেন, তখন যয়নাব আরও অধিক অপমান বোধ করলেন। মহানবী (সাঃ) নিজে বিয়ে করে তাঁর আহত মনকে সুস্থ করলেন। মিশরের বাদশাহ্‌ কর্তৃক উপহার স্বরূপ প্রেরিত দাসী 'মারীয়া'কে তিনি হিঃ ৭ম সনে বিয়ে করেন। এ বিবাহের মাধ্যমে তিনি একজন দাসীকে 'উম্মুল মু'মেনীন' এর উচ্চাসনে সমাসীন করতঃ ক্রীতদাস প্রথার মর্মমূলে আঘাত হানেন এবং মানুষে মানুষে ভেদা-ভেদের চিরাচরিত প্রথাকে সমূলে উৎখাত করেন।

এসব মহিলাদের কেউই তাঁদের যৌবন বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে তেমন পরিচিত ছিলেন না। সকলেই ছিলেন পরিত্যক্তা, অবহেলিতা, গতযৌবনা দরিদ্র নারী। তিনি যে সময়ে বিবাহগুলি করেন, সে সময়ে (২য় হিঃ হতে ৭ম হিঃ পর্যন্ত) তিনি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বেশী ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে নিপতিত ছিলেন। অনবরত তাঁকে তখন যুদ্ধে বা অন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হত। প্রতি মুহূর্তে তাঁর জীবন ছিল সঙ্কটাপন্ন। তাঁর প্রাণাধিক ধর্ম ইসলাম ছিল বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণে। এমন বিপদসঙ্কুল অনিশ্চয়তার দ্বারপ্রান্তে বসে সম্ভোগের উদ্দেশ্যে, বিবাহের পর বিবাহ করার কথা কি কোন সুস্থ মানুষ চিন্তা করতে পারে? অথচ মানবেতিহাসের প্রদীপ্ত সূর্যসম, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান নেতা (সাঃ)-এর উপরে, অবিবেচক ছিদ্রান্বেষী সমালোচকেরা খুঁতের সন্ধান করে। সম্পূর্ণ আরব দেশ বিজয়ের পরও তিনটি পূর্ণ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। আরব দেশের সবকিছুই তখন তাঁর ইচ্ছায় চলত। কৈ, ঐ তিন বৎসরে তো তিনি একটি বিয়েও করেন নি? এদ্বারা কি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় না যে, তাঁর বিবাহগুলির সাথে ভোগ-সম্ভোগের কামনা-বাসনা জড়িত ছিল না? বরং মানব মঙ্গলের বহু বিষয় জড়িত ছিল, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ওফাতের পরে রসূলে মকবুল (সাঃ) যে কয়টি বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের সবাই ছিলেন বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা অথবা যুদ্ধ-বন্দিনী প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা রমণী। একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই ছিলেন অবিবাহিতা সদ্য-যৌবনা নারী। তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভাধর, তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তির অধিকারিণী সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণা, মেধাবী ও ধর্মসেবীকা। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম নিত্য সহচর হযরত আবুবকর সিদ্দীক। খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর, রসূলে করীম (সাঃ)-এর মনঃকষ্ট ও সঙ্গীহীনতা হযরত আবু বকরের সমবেদনা ও সহৃদয়তার অনুভূতিকে নূতন করে নাড়া দিল। তিনি তাঁর সর্বগুণাধার কন্যা আয়েশা দ্বারা খাদীজার স্থান পূরণের জন্য অনুপ্রাণিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে তাঁকে অর্পণ করলেন। বয়সের বিরাট তারতম্য থাকায়, কতক পাশ্চাত্য সমালোচক, তাঁদের

দাম্পত্য জীবনের মূল্যায়ণ না করেই, এই বিবাহের ব্যাপারে অর্থহীন মন্তব্য করে থাকেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নিজের বিবাহিত জীবনকে সুন্দর, সার্থক, সুখময় ও সুমধুর বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও আয়েশা (রাঃ)-এর অসাধারণ গুণাবলীর জন্য পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করে গেছেন। এমনকি একথা পর্যন্ত বলেছেন যে, "ইসলামের অর্দ্ধাংশ তোমরা আয়েশার কাছেই শিখতে পার"। অতএব, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁদের দাম্পত্য জীবনে অতুলনীয় সমঝোতা ও ভালবাসা বিরাজমান ছিল। অথচ সমালোচকরা এরূপ মধুময় সম্পর্কের মাঝেও নিন্দাবাদের গন্ধ খোঁজে। একটি ক্ষুদ্র ঘটনাই সমালোচকদের মুখোস উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে একবার এক শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)কে কিছু খেজুর ও মিহি আটার রুটি উপহার দেন। খেতে বসে প্যাকেট খুলে আয়েশা (রাঃ) যখন মিহি আটার নরম রুটিগুলিতে হাত দিলেন, তখন তাঁর অজান্তেই তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি কেঁদে ফেললেন। মনে মনে ভাবলেন, তাঁর প্রিয়তম স্বামী, আল্লাহ্‌র রসূলের ভাগ্যে তাঁর জীবদ্দশায় এমন উত্তম খাদ্য কখনও জুটেনি। তাঁকে ফেলে কি করে এমন উপাদেয় রুটি তিনি ভক্ষণ করতে পারেন? এই ভেবে, ঐ রুটি তাঁর পক্ষে খাওয়াই সম্ভব হল না। এমন দৃষ্টান্ত প্রেমের জগতেও খুবই বিরল। তবুও সমালোচনার জন্য সমালোচকরা কিছু একটা খুঁৎ বের করবেনই। কারণ এটাই তাদের কাজ।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ ওয়া আলা আহলেহি

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

কেন মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের প্রতি আরোপ করা হবে? আর শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলমান বিনা প্রতিবাদে এইসব কাহিনী শুনবেন আর মাথা নিচু করে মিথ্যা সওয়াবের হিসাব করবেন? মৌলানা আকরাম খাঁ রচিত "মোস্তফা চরিত" বাংলা ভাষায় রচিত অন্যতম গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক নবী-জীবনী-গ্রন্থ। এই গ্রন্থেতো এইসব কিস্‌সার উল্লেখ নেই বরং বলিষ্ঠ ভাবে এইসব কল্পিত কিস্‌সা কাহিনীকে মিথ্যা কল্পনা বলে সাব্যস্ত করেছেন। মিথ্যা বলা মহা পাপ। তদুপরি, যে মহামানব (সাঃ) বিশ্বের প্রতি ঘরে ঘরে সত্য প্রতিষ্ঠার মহাব্রত নিয়ে নিজের সারাটা জীবনকে সেবায় লাগিয়েছেন, সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে যিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সংগ্রামে লিপ্ত রেখেছেন, অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন, অনিদ্রায়-অর্দ্ধনিদ্রায় সাধনাতে নিশি যাপন করেছেন, সেই পবিত্রতম মহানবী (সাঃ)-এর উপর মিথ্যা কথা কপ্‌চানো কি কখনও সওয়াবের কাজ হতে পারে? হায়রে উল্টা পথের পথিক! এটাতো সীরাতুল মুস্তাকীম নয়ই বরং এটাও গোমরাহীর পথ, এটা পদস্খলনের জাজ্বল্যমান চিহ্ন। ওপথে পা বাড়ায়োনা ভাই। মহনবী (সাঃ) যে তোমাদের মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বয়ং সাক্ষ্য দিবেন।

যুবকদের আদর্শ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

সব ভালোরই একটি শেষ ভালো আছে—আছে একটি শেষ সীমা। তেমনি সব পরিমাপেরই একটি তুলনামূলক মানদণ্ড আছে। তাই মানুষের নৈতিকতা তথা চরিত্রেরও একটি মানদণ্ড—একটি আদর্শ থাকতে হবে। এজন্যে চাই একটি আদর্শ জীবন। যৌবন হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই যুবকের জন্যে অবশ্যই চাই একটি আদর্শ জীবন—যা সে অনুকরণ করতে পারে। মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এমন একটি আদর্শ জীবন রয়েছে যার কোন তুলনাই মানবেতিহাসে নেই।

তাই আসুন আজকের বিভ্রান্ত যুব সমাজের জন্যে একটী আদর্শ জীবনের সন্ধানে আমরা চৌদ্দশো বছর পেছনে ফিরে তাকাই। সময়ের বিচারে কারো কারো কাছে এটিকে অনেক পুরানো মনে হতে পারে—কিন্তু উপযোগিতার বিচারে তা মোটেই পুরোনো নয়। কারণ মানুষের মৌলিক চরিত্র ও স্বভাব (ফিতরত) কি কখনো পুরোনো হয়—বদলে যায়? মোটেই নয়।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহে উসউয়াতুন হাসানা"—অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আল আহ্যাব, ২২ আয়াত)। তাঁর সারাটা জীবনের মতই যৌবনও ছিল যুবকদের জন্যে আদর্শ। যৌবনকালে তাঁর (সাঃ) চরিত্রের নির্মলতাকে পর্যবেক্ষণ করে হযরত খাদীজা (রাঃ) যে বর্ণনা দেন তা হাদীস থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। সর্ব প্রথম ওহী পাবার পর নবী করীম (সাঃ) নিজ স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে পরম ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, আমি আমার জীবননাশের আশংকা করছি। তখন খাদীজা (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ কখনও আপনাকে ধ্বংস করবেন না, অপমানিতও করবেন না, কেননা আপনি আত্মীয়তা রক্ষা করেন এবং নিঃস্ব লোকদের জন্যে উপার্জন করেন (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর এ অর্থও করেছেন যে, আপনি সুপ্ত নৈতিক গুণাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করেন —লেখক), অতিথিদের আতিথেয়তা করেন এবং বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করেন।" (সহী বুখারী কায়ফা কানা বাদ্উল ওয়াহী)। এতবেশী গুণ একজন যুবকের মধ্যে থাকলে তিনি সত্যিই একজন সেরা যুবক হবেন এতে আর সন্দেহ কি?

তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত তাই সবাই তাঁকে চিনত 'আল্ আমীন' বা পরম বিশ্বস্ত হিসেবে। তিনি শুধু বিশ্বস্তই ছিলেন না, তিনি ন্যায় বিচারকও ছিলেন। তাঁর যৌবনকালে একবার কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন কুরাইশদের পক্ষ থেকে ওলীদ ইবনে মুগীরা জেদ্দায় গিয়ে কাঠ কিনে আনেন এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কুরাইশ বংশের প্রত্যেকটি শাখা কাবা ঘরের একেকটি অংশ নির্মাণের ভার নেয়। গৃহ নির্মাণের পরে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন নিয়ে সৃষ্ট তীব্র মতবিরোধের

ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধের রূপ নেয়ার আশংকা দেখা দিল। কারণ সব নেতাই নিজ হাতে পাথর স্থাপনে আগ্রহী ছিল। বিতর্কে পঞ্চম দিনে কুরাইশদের মধ্যকার সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে মুগীরা ঘোষণা করেন যে, পরদিন প্রভাতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি পবিত্র কা'বা ঘরে আগমন করবে তাঁকেই এ বিষয়ে মীমাংসার ভার দেয়া হবে। পরদিন সকালে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে প্রবেশ করাতে তাঁকেই এই ভার দেয়া হয়। তিনি প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন লোক এই কর্মের জন্যে নির্বাচন করার প্রস্তাব দিলেন। তারপর একটী চাঁদর বিছিয়ে কালো পাথরটি চাঁদরে রাখলেন। এরপর নির্বাচিত নেতাদেরকে চাঁদরের কোণা ধরে নির্দিষ্ট স্থানে পাথরটি উঠিয়ে নিতে বললেন। সেই স্থানে নেয়া হলে তিনি নিজ হাতে সেই পাথরটি কা'বা ঘরের প্রাচীরে রেখে দিলেন। যাঁকে মহান আল্লাহ্ সমগ্র মানবজাতির সমস্যা মীমাংসার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, এই দিন ছিল তাঁর মীমাংসার নমুনা। উল্লেখ্য যে, এভাবে সেদিন একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে তাঁর জাতিকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে পরিচিতরা সবাই ছিলেন নিষ্কলুষ। কোন অসৎ ব্যক্তির সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল না। এঁদের মধ্যে ছিলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত হাকীম ইবনে হাযাম (রাঃ) [হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর চাচাত ভাই] হযরত জামাদ ইবনে সালাবা (রাঃ) (শল্য চিকিৎসক) হযরত কায়েস ইবনে সায়েব (রাঃ) (ব্যবসায়ী) প্রমুখ।

তিনি যখন ব্যবসা করেছিলেন তখনও সততা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দিক দিয়ে ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আল হামসা (রাঃ) বলেন, নবুওয়াতের পূর্বকালে তিনি তাঁর (সাঃ) সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ করেছিলেন। তাঁর কাছে দামের কিছু অংশ বাকী ছিল। তিনি তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার কথা বলে অন্যত্র গিয়ে ফেরার কথা ভুলে গেলেন। এ ঘটনার তৃতীয় দিনে সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে সেখানে অপেক্ষারত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, তিনি (হুযূর-সাঃ) তিন দিন যাবৎ তাঁর অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। এমন নিষ্ঠাবান যুবক ছিলেন আমাদের আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

তিনি ছিলেন শান্তির দূত। এই সন্ত্রাস ও অশান্তির সমাজে তাঁর আদর্শের বড়ই প্রয়োজন। অন্ধকার যুগে তিনি জ্বেলে ছিলেন আলো। যুদ্ধ বন্ধের জন্যে মিলে ছিলেন এক শান্তি সংঘ—হিলফুল ফুযুলে। আজও বড়ই প্রয়োজন তাঁর আদর্শের—বড়ই প্রয়োজন এই শান্তি সংঘে আশ্রয় নেবার। মানুষ মরণশীল। সে শারীরিকভাবে চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু বেঁচে থাকে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ। এ যুগেও তাঁর আদর্শ এতটুকুও পুরোনো হয়ে যায় নি। উপরের আলোচনাটি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন বটে—তবে সিন্ধুও যে দর্শনযোগ্য তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

তথ্যপঞ্জী

১। The Introduction to the study of the Holy Quran : Hazrat Mirza Bashir uddin Mahmood Ahmad (R)

২। The Life of Muhammad—Sufi Mutiur Rahman Bengli.

৩) সীরাতুন্নবী (সাঃ) প্রথম খণ্ড—আল্লামা শিবল নোমানী।

প্রকৃত সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর সন্ধানে

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

মানবতার মুক্তির দূত, নবীকুল শিরোমনি, খাতামান্ নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম এবং ওফাত দিবস পালন হয়ে থাকে দীর্ঘ দিন ধরে। কেউ "মিলাদুন্ নবী", কেউ "সীরাতুন্ নবী (সাঃ) দিবস হিসাবে এই দিনকে পালন করেন। যে মহামানবের জন্ম না হলে এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যেত, মানবজাতি মুক্তির সীরাতুল মুস্তাকিম বা সহজ সরল পথ খুঁজে পেত না, সেই মহামানবের জীবনাদর্শ যুগ যুগ ধরে আলোচিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইদানিং "ঈদে মিলাদুন্নবী" নামে এমন সব অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে এবং এই সব অনুষ্ঠানে এমন সব কিস্‌সা কাহিনী বয়ান করা হয়, যার সাথে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনের কোন যোগসূত্রই নেই। এক শ্রেণীর পেশাদার মৌলভী মাওলানা নবীজীর জীবন মাহাত্ম্য বর্ণনার নামে এমন সব হালকা, অবাস্তব কল্প-কাহিনী বর্ণনা করেন, যা প্রকারান্তরে মহানবী (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শকে অবমাননা করার নামান্তর।

মহানবী (সাঃ) কে "মানব জাতির জন্য আদর্শ" বলে খোদাতা'লা আখ্যায়িত করেছেন। তাই এই মহা মানবের জীবন সাগর হতে চিরকাল মানুষ মণিমুক্তা আহরণ করবে। অনন্তকাল মানুষ তাঁর জীবনাদর্শ থেকে চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করবে। কিন্তু ইদানিং মিলাদুন্ নবী অনুষ্ঠানে সওয়াব হাসিলের নামে যে সব মিথ্যা ও বানোয়াট কিস্‌সা কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মহানবী (সাঃ)-এর সত্যিকার জীবনাদর্শ বা সীরাতকে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার লক্ষ্যেই যেন এই সব উদ্ভট কল্প-কাহিনী বানানো হচ্ছে। এই কল্প-কাহিনী এমনই বিচিত্র ও হাস্যকর যে, মহানবী (সাঃ)-এর ঐতিহাসিক জীবন, যা কুরআন হাদীসের বর্ণনায় আমরা লাভ করি, তার সাথে এর কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। তাছাড়া এইসব কল্প-কাহিনীতে এমন কোন আদর্শের উল্লেখও থাকে না যা মানুষ অনুসরণ করতে পারে। সীরাতুন্ নবী (সাঃ) আজ তাই শুধু সওয়ার হাসিলের অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। এইসব অনুষ্ঠান থেকে সাধারণ মানুষকে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়, নিজের জীবনে প্রতিপালনের জন্য কোন আদর্শ সেখান থেকে লাভ হয় না।

মিলাদুন্ নবী অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ যে সব কিস্‌সা কাহিনী বলা হয় তার কিছু নমুনা উল্লেখ করতে চাই, যাতে চিন্তাশীল পাঠক বুঝতে পারেন মহানবী (সাঃ)-এর সীরাত থেকে বর্তমান মুসলিম সমাজ কত দূরে সরে যাচ্ছে। মিলাদুন্ নবী মাহফিলে মৌলভী সাহেব বয়ান করেছেন—

১। যেদিন মহানবী (সাঃ) মাতৃগর্ভে আগমন করেন, সেদিন কাবাঘরের ৩৬০টি মূর্তি মাথা নিচের দিকে এবং পা উপরের দিকে করে উল্টে গিয়েছিল—পরে কে এইসব মূর্তিকে আবার সোজা করে দিয়েছিল তা কিন্তু মৌলভী সাহেব বলেন নি।

২। আমাদের নবী (সাঃ) বড়ই পবিত্র ছিলেন, এমন কি তার শরীরের ঘাম এবং প্রস্রাব পায়খানাও পবিত্র ছিল। তাই এসব মাটিতে পরত না সাথে সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত!

৩। আমাদের নবীজী ছিলেন নূরের নবী, তাই তাঁর শরীরে কোন ছায়া মাটিতে পড়ত না!

৪। নবীজী কত ন্যায় বিচারক ছিলেন, শিশুকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শিশু কালে হালিমার এক স্তনের দুধ পান করে, অন্যটি তাঁর দুধ ভাই-এর জন্য রেখে দিতেন। শত চেষ্টা করেও তাঁকে সে স্তনের দুধ খাওয়ানো যেত না।

৫। যেদিন নবী মোহাম্মদ (সাঃ) মা আমিনার গর্ভে অসেন, সেই রাতে ১০ হাজার কুরাইশ রমণী আফসোস করে আত্মহত্যা করেছিল, এই দুঃখে মহানবী কেন তাদের গর্ভে এলেন না! এরূপ আরও অনেক বিচিত্র ও হাস্যকর কথা বলা হয়ে থাকে।

পত্র-পত্রিকায় এবং রেডিও, টেলিভিশনেও আজকাল এইসব অবাস্তব কিস্‌সা কাহিনী প্রচার করা হয়। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ১২ই অক্টোবর ১৯৮৯ ইং সংখ্যায় এমনি কিছু উদ্ভট কথা প্রকাশিত হয়। "রসূলে পাক (সাঃ) বেলাদতের সময়ে অলৌকিক ঘটনা" শিরোনামে জনৈক মৌলানা অছিয়র রহমান লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়:

—"হযরত আমেনার গর্ভে রসূলে খোদা তাশরিফ আনার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি ছিল যে, কোরাইশ গোত্রের প্রতিটি চতুষ্পদ জন্তু সে শুভরাত্রে মানুষের ন্যায় কথা বলেছিল এবং স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, অদ্য রাতে আল্লাহ্‌র রসূল মাতৃগর্ভে পদার্পণ করেছেন।" আরও লিখেছেন, "উক্ত মোবারক রাতে দুনিয়ার সকল রাজা বাদশাহ্‌র সিংহাসন ঝুঁকে গিয়েছিল!" আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন, "হুযুর করীমের সম্মানার্থে তাঁর আবির্ভাবের বছর দুনিয়ার সমস্ত গর্ভবতীরা ছেলে সন্তান প্রসব করেছিল।" পাঠক, এখানেই শেষ নয়, আরও আছে, এরপর লিখেছেন, "পদার্পণের সাথে সাথে সেজদায় ঝুঁকে গেলেন, এবং হাতের অঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠালেন, যেন দোয়া ফরিয়াদে তিনি ব্যস্ত হয়ে আছেন।" অবশেষে উক্ত মাওলানা সাহেব লিখেছেন, "নবী করীম (সাঃ) খাতনাকৃত নাভী কাটা পাক-পবিত্র অবস্থায় দুনিয়াতে পদার্পণ করেছেন!"

পাঠক, অত্যন্ত আশঙ্কায় ছিলাম, এরপর হয় তিনি বলে বসবেন যে, আমাদের নবী মাতৃগর্ভেই জন্ম নেন নি। তিনি অত্যন্ত পাক পবিত্র হয়ে আকাশ থেকে হঠাৎ মাটিতে পড়লেন! বস্তুতঃ কথা হল, মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র সীরাত আজ মুসলমানগণ হারিয়ে ফেলেছেন। যদি তাই না হবে, তাহলে এই সব আজগুবী কথা ও বানাওয়াট কিস্‌সা কাহিনী

(অবশিষ্টাংশ ২৩ পাতায় দেখুন)

ইসলাম ও দাসপ্রথা

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

দাসপ্রথা অতি প্রাচীন। ইসলাম-পূর্ব যুগে এর প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। ভৃত্য আর দাসের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ভৃত্য শব্দের অর্থ, যে পরের অন্নে পালিত হয়। সংস্কৃত ভার্যা অর্থও তাই। ভৃত্য আর ভার্যা সমার্থক। অনুরূপ চাকর আর দাসের মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান। চাকুরী যে করে সে চাকর। যদিও কাউকে বলা হয় সে চাকুরী করে, তাহলে সে রাগ করবে না, কিন্তু রাগ করবে চাকর বললে। দাস বলতে বুঝায় যার স্বাধীনতা নেই, যে অপরের অধীন, গোলাম। নানা ভাবে দাস হত মানুষ। যেমন (১) বিশেষ বংশে জন্ম নিলে, (২) কোন জাতি অপর কোন জাতিকে পরাজিত করলে দখলিকৃত ব্যক্তি, (৩) চুরি বা হাইজাক করে আনা ব্যক্তি, (৪) গুরুতর অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করার জন্য (৪) ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য, (৬) কখনও পিতামাতা অভাবের কারণে সন্তানকে বিক্রয় করে দিলে (৭) দাসীর পেটে জন্ম নিলে। প্রাচীন ভারতে সাত প্রকার দাস ছিল। যথা, ধ্বজা দাস, ভক্ত দাস, গৃহজ, দত্ত দাস, ক্রীত দাস, দত্রিম ও পৈত্রিক (মনু, ৮/৪১৫)।

রোমানদের মধ্যে দাসপ্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোর। গলায় এবং পায়ে লোহার বেড়ি লাগান হতো। লোহা গরম করে গায়ে চিহ্ন দেয়া হতো। বাজারে গরু ছাগলের মত দাসদেরকে বেঁধে এনে বিক্রয় করা হতো। কোন কোন সময় মাকে এক জায়গায় আর সন্তানকে অন্য জায়গায় বিক্রি করা হতো। দাসকে হত্যা করা আইনত কোন অপরাধ ছিল না। শাস্তি স্বরূপ দেহের মাংস কেটে ফেলা হতো। হিংস্র পশুর সম্মুখে ছেড়ে দেয়া হতো।

ভারতে দাসদাসী আর নারীর মর্যাদা ছিল সমান। ধর্মশাস্ত্র পড়ার বা শোনার অধিকার তাদের ছিল না। বিবাহিতা স্ত্রী হাতে এবং পায়ে লোহার কড়া পড়তো দাসত্বের প্রতীকরূপে। নাক ছিদ্র করে (ভিতর দিকে) আংটা পরতে হতো (আজও প্রচলন আছে)।

আরব দেশে বাজারে দাস দাসী বেচা কেনা চলতো পশু বিক্রির মত। এদের সঙ্গে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হতো। দাস দাসীর ক্রন্দন শ্বাস আর হা হুতাশ নীল আকাশে বিলীন হয়ে যেত, কারণ পৃথিবীতে তা শুনবার মত কেউ ছিল না।

বর্তমান জগতের সবচাইতে শক্তিশালী দেশ আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের ইতিহাস যারা জানেন তারা দাসপ্রথার নির্মম কাহিনীর খবর রাখেন। যারা 'রুট্‌স্‌' নামে গ্রন্থটি পড়েছেন অথবা এর চিত্ররূপ দেখেছেন তারা দাসের জ্বালা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ফাঁদ দিয়ে আফ্রিকার গ্রাম থেকে কত মায়ের বুকের ধন, কত প্রিয়ার হৃদয়ের স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করে বলিষ্ঠ যুবকদেরকে ধরে আনা হয়েছে শিকারের আনন্দে, সুকৌশলে। এরপর জাহাজের পাটাতনে

শিকল দিয়ে বেঁধে চালান দেয়া হয়েছে এক মহাদেশ থেকে অপর মহাদেশে। এদের নোনতা অশ্রু হারিয়ে গেছে লবণাক্ত অগাধ সাগর জলে। আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে অসহায়ের ক্রন্দন রোলে যখন আকাশ প্রকম্পিত, গরল নিঃশ্বাসে যখন বায়ুমণ্ডল দূষিত নিপীড়িতের বুক ভাঙ্গা শ্বাস প্রশ্বাস আর হত শ্বাসের হা হুতাস যখন পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলল, তখন আল্লাহ্‌র রহমতের দরিয়ায় বান ডেকে আসল। রাব্বুল আলামীন রহমানুর রহীম আল্লাহ্‌ প্রেরণ করলেন রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে। তিনি ঘোষণা করলেন "যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে, শেষ বিচারের দিনে আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াব (বোখারী)। পৃথিবী এর আগে আর কখনও এহেন উচ্চারণ শুনতে পায়নি। এই বলিষ্ঠ ঘোষণা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এক বিরাট বিস্ফোরণতুল্য। তিনি বললেন, "মুক্ত মানুষকে যে দাস বানায় তার নামায হয় না" (আবু দাউদ, তিরমিযী)। অর্থাৎ কোন প্রকৃত মুসলমান কখনও কাউকে দাস বানাতে পারে না। দাসপ্রথার সমর্থক যারা তারা মহানবী (সাঃ)-এর শত্রু। আল্লাহ্‌ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন না। এর চাইতে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে একজন বিশ্বাসীর জন্য?

পবিত্র কুরআনের উনিশটি আয়াতে দাস মুক্তির কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং ৬৩ জন এবং মা আয়শা (রাঃ) ৬৭ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বিভিন্ন অন্যায়ের কাফ্‌ফারা হিসাবে মহানবী (সাঃ) দাসমুক্তির বিধান দেন। আব্বাস (রাঃ) ৭০ টি দাস মুক্ত করেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর ১০০০, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) ত্রিশ হাজার দাস মুক্ত করেন। অন্যান্য সাহাবীরাও সাধ্যমত দাস মুক্ত করেন। বায়তুলমাল থেকে অর্থ দিয়েও দাসমুক্ত করা হয়। ফলে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে ক্রীতদাস স্বাধীনতা লাভ করে। মহানবী (সাঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী ক্রীতদাস হওয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স বিপ্লবের পর ইউরোপে দাসপ্রথা অবৈধ ঘোষিত হয়। অপরদিকে ফরাসী বিপ্লবের এক হাজার একশত বৎসর পূর্বেই বিশ্ব নবী (সাঃ) এই অমানবিক প্রথার মূলোচ্ছেদ করেন।

ইসলামে একমাত্র যুদ্ধবন্দী ছাড়া কোন প্রকার দাসত্ব বৈধ নয়। যুদ্ধবন্দীরা যেহেতু অপরাধী তাই তারা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত হতে পারত। এই মুক্তি বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে, অর্থের দ্বারা অথবা বন্দীরা কোন মুসলমানকে কোন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে লাভ করতে পারতো। নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দিয়ে বহু যুদ্ধবন্দী মুক্তি লাভ করেছে। যেসব নারী বন্দী হয়ে আসত তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হতো। যদি কেউ তাদেরকে পণ দিয়ে মুক্ত করে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা না করত, তাহলে তাদেরকে মুসলমানরা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নিতেন। অরক্ষিতা, বারাঙ্গণা হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে দেয়া হত না। সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার

জন্য যুদ্ধ বন্দিনীদেরকে তাদের তত্ত্বাবধায়করা বিয়ে করে যথার্থ সম্মান দিয়ে রাখতেন। এরা রক্ষিতা নয়, স্ত্রী। অনেকেই ভাগ্যবান সন্তানের জননী।

ইসলাম দাসমুক্ত করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তাদেরকে পুনর্বাসিত করেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহানবী (সাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে এদের কাছে বিয়ে দিয়েছেন। কাউকে কাউকে সেনাপতির পদে উন্নীত করেছেন। নবী সম্রাট (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের উপর যদি কোন হাবশী গোলামকেও আমীর নিয়োগ করা হয়, তবে তার কথা শ্রবণ কর এবং তার আদেশ মান্য কর (বোখারী)। মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, "যারা বেলালের (হাবশী ক্রীতদাস) পতাকার তলে আশ্রয় নিবে তারা নিরাপদ।" মানবতার এমন সম্মান কি আর কেউ দিতে পেরেছে? ক্রীতদাসের হাতে নিরাপত্তার পতাকা কি আর কেউ অন্যত্র দেখেছে? কী অপূর্ব, কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে—ইন-সানিয়াত যিন্দাবাদ! মানবতার জয় হোক! সৈয়েদনা বিলাল যিন্দাবাদ!

বাইবেলের বিধান, যারা সন্ধি করবে তাদেরকেও দাস বানাবে (দ্বিতীয় বিবরণ - ২০ : ১১)। ইসলাম এই নীতি সমর্থন করে না। যারা যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হয় তারাই একমাত্র যুদ্ধ-বন্দী দাস হবে। তারা মুক্তি পণ দিলে তাদেরকে আটকিয়ে রাখার অধিকার কারো নেই। কেউ যদি দাসকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড (বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি)।

ইসলাম কাউকে দাস দাসী বলে ডাকতে নিষেধ করেছে। বলতে হবে 'এই ছেলে', 'এই মেয়ে' (হাদীস)। মুসলমানদের কাছ থেকে (স্পেনের মাধ্যমে) ইউরোপ এই ভদ্রতাটিও শিখেছে। তাই ওরা হোটেল, রেস্তোরাঁয় কর্মরতদেরকে ডাকে 'বয়' বলে। দুঃখের বিষয় ইউরোপ আমাদের ভাল বিষয়গুলি গ্রহণ করেছে, আর আমরা গ্রহণ করেছি ইউরোপের মন্দ রূপটি!

পবিত্র কুরআন মোমেন দাসদাসী এবং স্বাধীন মোমেনদেরকে একে অপরের সমান বলে ঘোষণা করেছে। বলেছে,—বা'যুকুম মিমবা'য (নিসা, ২৬ আয়াত)। স্বাধীন পুরুষদেরকে মোমেন দাসী বিয়ে করতে উৎসাহ দিয়েছে। যথারীতি মোহরানা দিতে বলেছে (ঐ)

অনেকে প্রশ্ন করেন, ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ না করে এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করল কেন?

এর উত্তরে জানা দরকার যে, কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে এক কলমের টানে অথবা একটি ঘোষণার মাধ্যমে বা ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এজন্য ক্ষেত্র তৈরী করতে হয়। মনমানসিকতার পরিবর্তন সাধন করতে হয়। শক্তি প্রয়োগ করে, আইনের জোরে কিছু প্রয়োগ করলে তা পরিণামে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর কলকারখানাগুলি একটি মাত্র নির্দেশ বলে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু তাতে উৎপাদন কমে যায়। বাধ্য হয়ে

আবার তা বেসরকারী খাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ব্যাঙ্কগুলির বেলায়ও তাই হয়েছে। রাশিয়ায় সব কিছুই একটি দস্তখতের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়া হয়। সমাজ পরিবর্তন না করে আইনের জোরে তাড়াহুড়া করে যা করা হয়েছিল, আজ তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। উৎপাদন কমেছে বঞ্চনা বেড়েছে। হাত পাততে হয়েছে অকমিউনিষ্টদের দরবারে। খাদ্য চাই সাহায্য চাই, ৭৫ বৎসরের ব্যর্থতা নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি মৃত্যুবরণ করেছে সেখানে। মানুষের স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতি মোতাবেক ব্যবস্থা দেন। তাই হঠাৎ করে এক ঘোষণায় দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে সমাজ ব্যবস্থায় অঘটন না ঘটিয়ে হেক-মতের সাথে এর মূল উৎপাটন করা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানুষ ধীরে ধীরে নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। কোন প্রতিবিপ্লবের প্রশ্নই উঠল না এর ফলে। বাইরে থেকে কাউকে এই কুপ্রথা ভাঙ্গতে হল না। নিজেরাই পুণ্যের আশায় নিজ হাতে দাস প্রথার সমাপ্তি, বিলুপ্তি ঘটাল।

বর্তমানে শ্রমের যেমন রূপ পাল্টিয়েছে তেমনি দাসেরও রূপ বদলিয়েছে। নূতন রূপে দাস প্রথা আজো বিদ্যমান। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষণা করে— All human beings are born free and equal in dignity and rights. ৪৩ বৎসর যাবৎ এই তারিখটিতে বক্তারা বক্তৃতা দিয়ে আসছেন। ভবিষ্যতে আরো বক্তৃতা হবে মানবাধিকার দিবসে। কিন্তু নব-দাস প্রথার উচ্ছেদ হবে না কখনও। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পথে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ সম্ভব নয়।

আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলুপ্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আজো মে-ণ্ডেলার সংগ্রাম অব্যাহত। নানা ভাবে নানা রূপে বন্দীত্ব বরণ করে আছে পৃথিবীর অগণিত মানুষ। আর এথেকে মুক্তি লাভ একমাত্র ইসলাম প্রদর্শিত পথেই সম্ভব।

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। নতুন মোহরের অর্থই নতুন সম্রাট। তিনি পত্রটি খুললেন। তাতে লিখা ছিল :—

"খসরু সম্রাট সিরোস এর নিকট হতে ইয়েমেনের গভর্নর বাযানের প্রতি। আমি আমার পিতাকে হত্যা করেছি, কেননা তার শাসন দুর্নীতি এবং অন্যায়ে পরিণত হয়েছিল। তিনি গুণী ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন এবং প্রজাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন। এই পত্র পাওয়া মাত্র আপনার সকল কর্মচারীদের ডেকে আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার নির্দেশ দিবেন। একজন আরব নবীকে গ্রেফতারের বিষয়ে আমার পিতার আদেশ প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, ঐ সকল আদেশকে আপনি বাতিল বলে গণ্য করবেন।"

(তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭২-১৫৭৪ এবং হিশাম, পৃঃ ৬৪)

এই ঘটনাবলী বাযানকে এতই অভিভূত করেছিল যে, তিনি এবং তাঁর বেশ কিছু বন্ধু তৎক্ষণাৎ ইসলামের উপর তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করলেন এবং যথারীতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তা জানালেন।

সম্রাটগণের নিকট রসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর পত্র-২

মূল : হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ (রাঃ)

অনুবাদ : আবদুল্লাহ শামস বিন তারিক

[হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করে মদীনায় ফেরার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সম্রাটগণের নিকট দূত মারফত পত্র পাঠান যার বিবরণ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ (রাঃ) কৃত Introduction to the study of the Holy Quran গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থ হতে ধারাবাহিকভাবে এগুলো অনূদিত হল]

পারস্য সম্রাটের নিকট পত্র

পারস্য সম্রাটের নিকট প্রেরিত পত্রটির বাহক ছিলেন আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাঃ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ

"আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়। এই পত্রটি আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ এর নিকট হতে পারস্য অধিপতি খসরুর (পারস্য সম্রাটের উপাধি) প্রতি। যিনিই নির্ভুল হেদায়াতের নিকট নতি স্বীকার করেন, সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্‌ এক এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, এবং তাঁর কোন অংশীদারও নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে বাদশাহ, আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই। কেননা আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর রসূল হিসাবে সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আমি সকল অবিশ্বাসীর জন্য আমার বাণীকে পূর্ণ করতে পারি। ইসলাম গ্রহণ করুন এবং সমুদয় বিপর্যয় হতে নিজেকে রক্ষা করুন। যদি আপনি ইহা অস্বীকার করেন তবে আপনার সকল প্রজার অস্বীকৃতির পাপও আপনার উপরে বর্তিবে।"

(যুরকানী এবং খামীস)

আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি খসরুর দরবারে পৌঁছলেন তখন তিনি বাদশাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। (অনুমতি পেয়ে) তিনি বাদশাহ্‌কে পত্রটি দিলেন এবং বাদশাহ্‌ একজন অনুবাদককে সেটি পড়ে বুঝিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। বিষয়বস্তু শুনে খসরু ক্রোধান্বিত হলেন এবং পত্রটি নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। আবদুল্লাহ্‌ বিন হুযাফা (রাঃ) যখন ফিরে এসে এ ঘটনা মহানবী (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করলেন তখন তিনি বললেন,

"খসরু আমাদের পত্রকে যা করলেন, আল্লাহ্‌ তার সাম্রাজ্যকেও সেরূপ করবেন।' (অর্থাৎ, টুকরো টুকরো করে ফেলবেন — অনুবাদক)

এক্ষেত্রে খসরু যে আচরণ করেছিল, তা বস্তুতঃ ছিল রোমান অঞ্চল থেকে আগত ইহুদীদের ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারেরই ফল। পারস্যে রোমবিরোধী কার্যক্রমে এ সমস্ত ইহুদী উদ্বাস্তু অগ্রণী ভূমিকা পালন করত বলে পারস্যের রাজ দরবারে তারা প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

খসরু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিলেন। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত বর্ণনা দিয়েছিল বাদশাহ্‌র কাছে সেগুলো সত্য মনে হতে লাগল। (ইহুদীরা বলেছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য দখল করে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চান—অনুবাদক) তিনি ভাবলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বোধ হয় পারস্য আক্রমণের চক্রান্ত করছেন। তাই কিছুদিন পরই তিনি ইয়েমেনের গভর্নরের নিকট বার্তা পাঠালেন যে, আরবের কুরায়েশ বংশীয় এক ব্যক্তি নবী বলে দাবী করেছে। তার দাবীসমূহ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই গভর্নরকে নির্দেশ দেয়া হল, তিনি যেন দু'জন লোক পাঠিয়ে উক্ত কুরায়েশ বংশীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পারস্য রাজ দরবারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। খসরুর অধীনে ইয়েমেনের গভর্নর বাযান, একজন সেনাপতিকে একজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট প্রেরণ করলেন। তাদের সাথে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে একটি পত্রও দিয়ে দিলেন। পত্রে তাঁকে সৈন্যদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পারস্য গমন করার নির্দেশ দেয়া হল। সৈন্যদ্বয় প্রথমে মক্কা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তায়েফের নিকট কোন স্থানে পৌঁছে তারা জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় থাকেন। তাই তারা মদীনায় গেলেন। সেখানে পৌঁছে সেনাপতি বললেন যে, ইয়েমেনের গভর্নর বাযান খসরু কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন, তিনি যেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে গ্রেফতার করে পারস্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তারা বিনীতভাবে উপদেশ দিলেও তিনি যেন এই আদেশ মেনে নেন এবং তাদের সাথে পারস্যে গমন করতে সম্মত হন। ইহা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে পরের দিন দেখা করতে বললেন। রাতে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে জানালেন যে, খসরুর (সম্রাটের) এই অসদাচরণ তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ইলহাম হল ঃ

"আমরা তার নিজের পুত্রকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি এবং এই পুত্র তার পিতাকে এ বছরই ১০ই জমাদিউল আউয়াল রোজ সোমবার হত্যা করবে।"

কারো কারো মতে ইলহামটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"পুত্রটি তার পিতাকে হত্যা করেছে।"

হতে পারে ঐ রাতটি ছিল ১০ই জমাদিউল আউওয়ালের রাত। সকালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়েমেন থেকে আগত ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে পাঠালেন এবং রাতে তাঁর নিকট যে ইলহামটি অবতীর্ণ হয়েছে, তা জানালেন। তারপর তিনি বাযানের জন্য একটি পত্র লেখালেন, যাতে বলা হল যে, খসরু উক্ত নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট দিনে আততায়ীর হাতে নিহত হবেন। যখন ইয়েমেনের গভর্নরের নিকট পত্রটি পৌঁছল তখন তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি যদি সত্য রসূল হয়ে থাকেন, তবে তিনি যা বলেছেন, তাই হবে।" কিছুক্ষণ পরেই ইয়েমেনের গভর্নরের নিকট পারস্য সম্রাটের একটি পত্র নিয়ে একটি নৌকা ইয়েমেনের বন্দরে পৌঁছল। পত্রের উপরের মোহরটি ছিল নতুন এবং এ থেকে গভর্নরের মনে হল যে, আরব নবী (সাঃ)-এর

(অবশিষ্টাংশ ৩১ পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর রসূল-প্রেম

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور الرحيم ٥

[সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ৩২]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর রূহানী মাকাম বা মর্যাদা মূলতঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুসরণকারী ও পূর্ণ অনুকরণকারীর মর্যাদা। এত বেশী অনুসরণ ও অনুকরণ যে, এই অনুসরণের ফলে হযরত মাহ্‌দী (আঃ) হযরত রসূল (সাঃ)-এর নূরে নূরান্বিত ও হুযূর (সাঃ)-এর গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে, এতই একাত্ম হয়ে গেছেন যে, তিনি হুযূর (সাঃ)-এর প্রতিবিম্ব হয়ে গেছেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) নিজকে সম্পূর্ণরূপে রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে বিলীন করে দিয়েছেন। আগুনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোড়ালে, লোহা যেমন আগুনের রং ও গুণ হুবহু ধারণ করে ফলে তেমনি হযরত মাহ্‌দী (আঃ) আধ্যাত্মিকভাবে হযরত রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে নিজকে বিলুপ্ত করে নিজ সত্বাকে তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একীভূত করে দেবার ফলে, তাঁর মধ্যে হযরত রসূল (সাঃ)-এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এবং তিনি 'ফানা ফির রসূল' হয়ে, রসূল করীম (সাঃ)-এর মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গেছেন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন :

اس نور پر فدا ہوں اسکا ہی میں ہوا ہوں
وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

উস নূর পর ফিদা হুঁ উসকাহি মায় হুয়া হুঁ
উহ্‌ হ্যায় ম্যায় চীজ কিয়া হুঁ বাস্‌ ফয়সালা এহি হ্যায়

অর্থাৎ : আমি ঐ নূরের মধ্যে নিজকে বিলুপ্ত করেছি আমি তাঁহারই হয়ে গেছি। তিনি আসল। আমি তো কিছুই না। ইহাই শেষ ফয়সালা।

প্রবন্ধের আরম্ভে কুরআন শরীফের যে আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে হলে, হুযূর নবীয়ে করীম (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি হুযূর (সাঃ)-এর যত বেশী অনুসরণ করবে, সে তত বেশী আল্লাহ্‌র প্রিয় হবেন। এই আয়াতের বরকতে প্রত্যেক যুগে শত শত ব্যক্তি হযরত রসূল (সাঃ)-এর অনুসরণের ফলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে আসছেন। যেমন হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) প্রমুখ আউলিয়ায়ে কেরামগণ। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (আঃ)ও এমনই দাবী করেছেন যে, তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরে নূরান্বিত হয়েছেন। এখন তাঁর মধ্যে হযরত রসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। আর আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ইমাম মাহ্‌দী বলে মনোনীত করেছেন।

আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের দাবীর সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখছি যে, সত্যই তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে এত গভীরভাবে অনুসরণ করেছেন যে, তার মধ্যে নূরে মোহাম্মদীর প্রতিফলন ঘটেছে। এবং একথাই বলতে হয় যে, তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আপাদ মস্তক নিমজ্জিত ছিলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বাল্যকাল থেকেই অসাধারণভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। একজন বড় সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশীয় হওয়া সত্বেও শৈশবে, কৈশোরে এবং যৌবনে কখনো তিনি জাগতিক বা বৈষয়িক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হননি মোটেই। এবাদতের মধ্যে থেকে মসজিদের মাঝে দিন-রাত কাটানো ছিল বাল্যকাল হতেই তাঁর দৈনন্দিন কাজ। কুরআন পাঠ ও হামেশা তিনি চরমভাবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা রাখতেন। প্রতি পদে হুযূর (সাঃ)-এর আদর্শকে একান্ত ভাবে পালন করতেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কিছু ঘটনাবলী তুলে ধরা হল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে সরদার ঝাণ্ডা সিং বলতেন: আমরা অনেক সময় হযরত মির্যা সাহেবের নিকট যেতাম। তিনি আমাদের বলতেন "তোমরা আমার আব্বা জানকে সুপারিশ করে বল, তিনি যেন আমাকে পার্থিব কাজের আদেশ না দেন। আমাকে ধর্মের সেবা করতে সুযোগ দেন।" সরদার ঝাণ্ডা সিং মির্যা সাহেবের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন" মির্যা সাহেব জন্মগত 'ওলী' (আল্লাহ্‌র দোস্ত) ছিলেন। [আহ্‌মদীয়াত ইয়ানি হাকিকী ইসলাম, পৃঃ ১০৬]

মালিক গোলম মোহাম্মদ শাহ্ সাহেব বলেছেন:

"আমি ছুটিতে একবার কাদিয়ান গেলাম। দেখি, মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের পিতা) খুব ব্যস্ত। তাঁকে ব্যস্ত দেখে বল্লাম, এ কাজ তো আপনার ছেলে বা চাকরই করতে পারে। উত্তরে মির্যা সাহেব বললেন, আমার বড় ছেলে মির্যা গোলাম কাদের গুরুদাস পুরে চাকুরী করে। আর আমার ছোট ছেলেকে দেখবে, আস! মির্যা সাহেব আমাকে উপরে ছোট্ট একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। দেখি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব গভীর মনোযোগ সহকারে একখানা কিতাব পড়ছেন, সম্ভবতঃ হাদীস গ্রন্থ। কিন্তু তিনি বই পড়তে এতই মগ্ন ছিলেন যে, আমাদের উপস্থিতি টেরই পান নি। আমরা নীচে এলাম। বড় মির্যা সাহেব বল্লেন, দেখলেন আমাদের ছোট ছেলেকে! সে কি জীবিতদের মধ্যে রয়েছে? [সীরাতুল মাহ্‌দী, ৪র্থ খণ্ড-১২৬০ পৃঃ]

হযরত ইয়াকুব আলী ইর্‌ফানী (রাঃ) লিখেছেন:

হযরত মির্যা সাহেবের প্রাথমিক জীবনের (যৌবন) অভ্যাস ছিল নিজ কক্ষ বন্ধ করে ভেতরে থাকা। শিয়ালকোটে চাকরীরত অবস্থায় একবার কিছু যুবকের কৌতুহল জাগল যে, দেখা দরকার হযরত মির্যা সাহেব ভেতরে কি করেন। তারা একদা ভেতরে কোন ফাঁক

দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল যে, মির্যা সাহেব জায়নামাযে বসে কুরআন শরীফ পড়ে দোয়া করছেন হে আল্লাহ্! ইহা তোমার পবিত্র কালাম। তুমি আমাকে এই মহা গ্রন্থ বুঝবার শক্তি দাও। নতুবা আমি কি করে বুঝব। [হায়াতুন নবী, পৃঃ ১১০]

হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুত্র] বলেছেন : "আব্বাজান কমপক্ষে হলেও দশ হাজার বার পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ সম্পন্ন করেছেন।" [হায়াতুন নবী, ১০৮ পৃঃ]

হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেছেন :

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন : "كان خلقه القرآن" "কানা খুলুকুহুল কুরআন" অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র কুরআন শরীফের বাস্তব রূপ ছিল। হযরত রসূল (সাঃ)-এর দাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবও তাঁর প্রিয় ইমাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণে জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর চরিত্র কুরআন শরীফের বাস্তব চিত্র ছিল। আমি আগেই বলেছি যে, হযরত মির্যা সাহেব যা করতেন, তা ছিল তাঁর একেবারে স্বভাবজাত। অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে করতেন। তাঁর কাজে ও কথায় কোন প্রকার কৃত্রিমতা বা বানাওটি বা তাকাল্লুফের বালাই ছিল না। বরং আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ইচ্ছার ফলে, হযরত সাহেবের জীবন প্রণালীতে এ রকম ঘটেছে যেরকম অন্যান্য নবীগণ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বেলায়ও ঘটেছিল। [বক্তৃতা জলসা সালানা 'যিকরে হাবিব' আল ফযল, ১লা জানুয়ারী-১৯৫৭]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কবিতায় লিখেছে :

مصطفی پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت

মুস্তফা পর্ তেরা বেহদ হো সালাম আওর রহমত।

اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے

উস সে ইয়ে নূর লিয়ে বারে খুদায়া হামনে,

ربط ہے جان محمد سے مری جاں کو مدام

রাব্‌ত হ্যায় জানে মোহাম্মদ সে মেরি জাঁকো মোদাম

دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے -

দিল কো উহ্ জাম লাবা লাব হ্যায় পিলায়া হামনে।

অনুবাদ : মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর তোমার সালাম ও রহমত হোক।
তাঁর থেকেই এই নূর আমরা লাভ করেছি, হে খোদা!
মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণের সাথে আমার প্রাণ এক সূত্রে বাঁধা
আমি আমার আত্মাকে মোহাম্মদী সুধা খুব পেট ভরে পান করিয়েছি।

হযরত মাহ্‌দী (আঃ) আরবী ফারসী ও উর্দুতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসা ও গুণাবলীতে ভরা এক অপূর্ব মহাকাব্য রচনা করেছেন যার নাম দুররে সামীন। ঐ কাব্যের

প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি পঙ্‌ক্তি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই কবিতার রচয়িতা একজন রসূল-প্রেমে বিভোর ব্যক্তি। ইংরেজ শাসনামলের শেষ যুগে ভারতের মন্ত্রী সভায় একজন মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ করা হত। একবার যখন শিক্ষা মন্ত্রী স্যার ফযল হোসেন অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্থলে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। আমাদের মুসলমান আলেম সমাজের কয়েকজন মৌলানা স্যার ফযল হোসেন সাহেবের নিকট গিয়ে বল্লেন যে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (আহমদী) কাদিয়ানী জামাতের লোক। তাঁকে আমরা মুসলমান মনে করি না। অতএব, তাঁকে মুসলমানদের তরফ থেকে মন্ত্রী হয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া যায় না। স্যার ফযল হোসেন তাদের কথা শুনে, নিজ বাসস্থানের ভেতরে গিয়ে, মির্যা সাহেব প্রণীত 'দুররে সামীন' গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে ফেরৎ এসে বললেন, এই পবিত্র গ্রন্থের যিনি রচয়িতা তিনি আর যাই হোন না কেন, অমুসলমান হতে পারেন না।

হযরত মাহ্‌দী (আঃ) যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে গভীর আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতেন তার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লাও প্রদান করেছেন। হুযূর (আঃ) লিখেছেন :

ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان معطر ہو گیا۔ اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اب زلال کی شکل میں نور کی مشکیں اس عاجز کے مکان میں لئے آتے ہیں۔ اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھیں۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔

(বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৮ হাশিয়া দার হাশিয়া)

অর্থ : এক রাতে আমি এত বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করি যে, আমার মন-প্রাণ সুগন্ধে ভরে গেল। অতঃপর, ঐ রাতেই স্বপ্নে দেখলাম যে, ফিরিশ্‌তাগণ 'আবে যুলাল' ধরণের নূরের মশক [মশক অর্থ ছাগলের আস্ত চামড়া যাতে করে মরু অঞ্চলে পানি বহন করা হত] ভরে আমার বাড়ীতে এনে ঢালছেন। একজন তাঁদের মধ্য থেকে বললেন, এগুলো ঐ বরকত যা তুমি দরূদ শরীফের আকারে হুযূর (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছ।"

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ) [হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর পুত্র] লিখেছেন :

"আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম আসলেই হযরত সাহেবের চোখে পানি এসে যেত। কখনও ইহার ব্যতিক্রম হয় নি। আসল কথা এই যে, হযরত সাহেবের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর প্রেম ভরা ছিল।"

(চার তাকরিরে যিক্‌রে হাবিব, পৃঃ ২৯)

একদা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) মসজিদে মোবারকে পদচারণা করছিলেন এবং হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ),এর কবিতার একটি পঙক্তি গুণ গুণ করে পাঠ করছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুতে হুযূর (সাঃ)-এরই স্মরণে সাবিত ইহা রচনা করেছিলেন। পাঠ করার সময় হযরত সাহেবের শোকাচ্ছন্ন চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। পঙতিটি ছিল:

كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر

من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذر

অর্থ: হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল! তুমি আমার চোখের মনি ছিলে, যা আজ তোমার মৃত্যুতে অন্ধ হয়ে গেছে। এখন তোমার মৃত্যুর পর আর যে কেহই মরুক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমিত একমাত্র তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিলাম - যা ঘটে গেছে।

যখন হযরত সাহেবের চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল, তখন একজন সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে ঐ অবস্থায় হযরত সাহেবকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, হুযূর! আপনার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? কিছু ঘটেছে কি?

হযরত সাহেব বলেন, আমি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)-এর এই কবিতার পঙতিটি পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম যে, হায়—যদি এমন সুন্দর কবিতাটির রচয়িতা আমি হতাম?

মির্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ) উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করে লিখছেন:

"হযরত মির্যা সাহেব নিজ জীবনে বহু বহু মর্মস্পর্শী ঘটনা দেখেছেন। বিরোধীরা হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে কত না বেদনাদায়ক ও কষ্টদায়ক ঘটনার অবতারণা করেছে। নিজ সন্তানদের কয়েক জনের মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে দেখতে হয়েছে। কিন্তু কখনও কোন কঠিনতম অবস্থাতেও হযরত সাহেবের চোখ থেকে পানি ঝরত না। কিন্তু এমন ব্যক্তি একান্ত নির্জনে হযরত নবীয়ে করীম (সাঃ)-এর স্মরণে এমন অশ্রু বিসর্জন করছেন! চোখ দিয়ে পানি ঝর ঝর করে ঝরে যাচ্ছে! হযরত প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে কতই না গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল তাঁর।"

(সীরাতুন মাহ্‌দী, ২য় খণ্ড রেওয়ায়াত নং ২২৩)

হযরত মির্যা সাহেবের পুত্র খান বাহাদুর মির্যা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব তাঁর পিতার জীবদ্দশায় বয়াত গ্রহণ করেন নি। বরং পরে ছোট ভাই হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। মির্যা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব যখন বয়াত গ্রহণ করেন নি, ঐ যুগে তাঁর ছোট ভাই মির্যা বশীর আহ্‌মদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হযরত মাহ্‌দী (আঃ)-এর সম্বন্ধে। উত্তরে মির্যা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব বলেন:

"একটি বিষয় বিশেষ ভাবে আমি আব্বাজানের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। বিষয়টি এই যে, আব্বাজান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানের বিপরীত কোন প্রকার বে-আদবী সহ্য করতে পারতেন না। সামান্যতম বিরূপ মন্তব্য বা অসম্মানসূচক কোন কিছু দেখলে বা শুনলেই তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন, চেহারা লাল হয়ে যেত, চোখের রং বদলে যেত, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যেতেন। আব্বাজান হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এত বেশী ভালবাসতেন যে,

আমি কখনও অন্য কাহারও মধ্যে তেমনটা দেখি নি। তিনি বার বার শেষ কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন।"

হযরত মির্যা সুলতান আহ্‌মদ ঐ যুগে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। একজন সু সাহিত্যিক ছিলেন। সুতরাং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল।

[সিরাতুল মাহ্‌দী, প্রথম খণ্ড—২য় পৃঃ]

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে হযরত মির্যা সাহেবের গভীর আন্তরিকতার প্রমাণ তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা। হযরত সাহেব হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অবমাননা সহ্য করতে পারতেন না বলেই তো ১৮৮০ খৃঃ বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর গ্রন্থ বারহীনে আহ্‌মদীয়ার লিখা পূর্বেও তিনি পাদ্রীদের সাথে বাহাস-মুবাহাসা করতেন।

হযরত মৌলভী শের আলী (রাঃ) বলেছেন যে, তাঁর সহপাঠী মোহাম্মদ আযম সাহেবের বড় ভাই বলতেন যে, হযরত মির্যা সাহেব যৌবনকালেই শিয়ালকোটে চাকুরীর সময় কখনও কখনও অমৃতসরে পাদ্রীদের সাথে বড় দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত বাহাস করতেন।

(সীরাতুল মাহ্‌দী, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃঃ)

ইতিহাস সাক্ষী যে, ঐ যুগে ভারতের গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, পাদ্রীরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত থাকত। লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছিলেন। এমন কি অনেক বড় বড় আলেমও খৃষ্টান হয়ে যান। তারা ইসলাম ও রসূলে আকরাম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বই লিখতেও লজ্জা বোধ করেন নি। যেমন পাদ্রী আবদুল হক, পাদ্রী আবদুল্লাহ আথম, পাদ্রী সিরাজুদ্দীন, এবং আরও অনেকে। একদিকে ইসলামের এই অধঃপতন অপরদিকে আলেম সমাজের অসহায় অবস্থা ও উদ্যমহীনতা দেখে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব সহ্য করতে না পেরে লেখনী ধারণ করেন। আর ইসলামের সত্যতা প্রমাণাদি সম্বলিত প্রায় তিন শত পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' নাম দিয়ে রচনা ও প্রকাশ করেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে।

বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে হযরত মির্যা সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্য নবী এবং কুরআন শরীফের বাণীকে সত্য খোদার সত্য বাণী প্রমাণ করে, অসংখ্য অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরেন। এতদসংগে তিনি সকল বিধর্মীদের আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দেন যে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য নবী বলে মনে করেন না এবং কুরআনকে আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম বলে স্বীকার করেন না, তারা যেন বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে প্রদত্ত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার দলিলসমূহ খণ্ডন করেন এবং তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মের সত্যতার দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যদি কেহ বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় উপস্থাপিত অকাট্য দলিল প্রমাণসমূহ খণ্ডন করে সমপরিমাণ দলিল প্রমাণ নিজ নিজ ধর্মের স্বপক্ষে

পেশ করতে পারেন, তবে তাকে দশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেয়া হবে। বিজ্ঞাপন পেয়ে অনেকেই দাবী করেছিলেন যে, তারা উত্তর লিখবেন। কিন্তু বস্তুতঃ কেহ আজ পর্যন্ত সাহস করেন নি। মির্যা সাহেব বিজ্ঞাপনে একথাও বলেছিলেন যে, যদি তোমরা সমস্ত দলিল খণ্ডন করতে না পার তবে অর্ধেক, যদি অর্ধেকও না পার তবে তিন ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগের খণ্ডন কর! তা করলেও দশ হাজার টাকার পুরস্কার দেয়া হবে।

তবে হ্যাঁ, এতে করে বাহাস-মুবাহাসার একটা সূচনা ঘটে। বিধর্মীদের কয়েকজন হযরত মির্যা সাহেবের সাথে বাহাসে নামেন। কিন্তু তারা লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ইতিহাস রয়ে গেছে।

হযরত মির্যা সাহেব 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' লেখার পরে ২৮ বছরে প্রায় ৮৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। হযরত মির্যা সাহেবের মূল বক্তব্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার সবচেয়ে প্রিয় নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর নবুওয়াত সুদূরপ্রসারী নবুওয়াত। অর্থাৎ আজও তাঁর (সাঃ) অনুসরণ করে তাঁর ফয়েয প্রাপ্ত হয়ে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হতে পারে। কুরআন আজও মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইহাই আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বিধান সম্বলিত মুক্তির বাণী।

মুহাম্মদী আদর্শের খাঁটী অনুসারী, তথা খাঁটী ঈমানদার মুসলমানের দোয়া আজও আল্লাহ্‌ কবুল করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন। হযরত মির্যা সাহেবের দাবী এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যতার পূর্ণ যুক্তিসমূহ এবং সন্দেহাতীত প্রমাণাদি দেবার জন্যই তাঁকে এ যুগে 'ইমাম মাহ্‌দী' করে পাঠিয়েছেন। আজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে রূহানী সম্পর্ক ছাড়া ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বা মুক্তি লাভ করা অন্য কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। আজ ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মের সত্যতা ও জীবন্ত অবস্থা প্রমাণ করতে সক্ষম নন। কারণ আজ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একমাত্র ইসলামই জীবন্ত ও চূড়ান্ত সত্য ধর্ম। কারণ আজ মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন নবী বা রসূলের নূর বা ফয়েয জারী নেই। আল্লাহ্‌ ও রসূলের (সাঃ) অনুসরণ পূর্ণ মাত্রায় অবলম্বন করে মানুষ এখন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং ঐ নৈকট্য প্রাপ্তির নানাবিধ নিদর্শনও প্রদর্শন করতে পারে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। হযরত মির্যা সাহেব দাবী করেন যে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নূর, বরকত ও ফয়েয জারী থাকার প্রমাণ দেব। অন্য কোন ধর্মের লোক এ বিষয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা করতে কখনও সক্ষম হবে না। এরূপ প্রতিযোগিতায় যিনিই হযরত মির্যা সাহেবের সামনে এসেছেন তিনিই, কুপোকাৎ হয়েছেন।

হযরত মির্যা সাহেবের যে কোন গ্রন্থ পাঠ করলেই একজন সরল অন্তঃকরণের মুসলমান বা ন্যায় বিচারক ব্যক্তি পরিষ্কার দেখবেন যে, হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্‌ ও রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রেমে নিজেকে নিঃশেষ করেছেন যার ফলে তিনি হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর অবমাননার সামান্য গন্ধও যাতে আছে, তা সহ্য করতে পারতেন না।

আর্য সমাজী নেতা পণ্ডিত লেখরাম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে খুব অপ-প্রচার করতেন এমন কি গালিগালাজও করতেন। নিজেদের প্রকাশিত সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখে কুৎসা রটাতেন। একদা পণ্ডিত লেখরাম ষ্টেশনে হযরত মির্যা সাহেবের খেদমতে গিয়ে সালাম করলেন। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব তার উত্তর না দিয়ে বল্লেন, যে ব্যক্তি আমার প্রভুকে গালি দেয়, আর আমাকে সালাম করে তার সালাম কি করে গ্রহণ করতে পারি? পরবর্তীকালে লেখরাম হযরত মির্যা সাহেবের সাথে মুবাহালা করে অপমৃত্যু বরণ করে।

পাদ্রী আবদুল্লাহ আথম সাহেবেরও ঐ একই দশা হয়েছিল। হযরত মির্যা সাহেবের সাথে পনর দিন পর্যন্ত ধর্মীয় বাহাস (বিতর্ক প্রতিযোগিতা) করে অবশেষে 'মুবাহালার' ফলে তিনি মারা যান। পনর দিন বাহাস শেষে পাদ্রীরা হযরত মির্যা সাহেবকে তাঁর সংগীগণ সহ চা-পানের নিমন্ত্রণ দেন। হযরত মির্যা সাহেব চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি।

(হায়াতে আহমদ, পুরাতন, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৪ পৃঃ)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলতেন, যদি আমার চোখের সামনে আমার সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আমার সন্তানদেরকে যবহ করা হয় তবে ইহা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর প্রতি বে-আদবী সহ্য করা সম্ভব নয়। (হায়াতুন নবী, পৃঃ ১৬০)

হযরত সাহেব তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"অন্য কোন কিছুতে আমার অন্তর এত ব্যথিত হয় নি যতটা ব্যথিত হয়েছে এদের হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রুপের কারণে যা তারা আঁমাদের প্রিয় নবীয়ে পাক (সাঃ)-এর সম্মানের বিরুদ্ধে করছে।......আল্লাহ্‌র কসম যদি আমার চোখের সামনে আমার সকল সন্তান-সন্ততি আমার সন্তানদের সন্তান, আমার সকল বন্ধু-বান্ধব, আমার সকল সহযোগীদের হত্যা করা হয় স্বয়ং হাত পা কেটে ফেলা হয়, আমার চোখের মণি বের করে ফেলা হয়, আমার সকল চাওয়া পাওয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়, আমার সকল আরাম আয়েশ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়, তবে এই সকল বিষয়ের চেয়ে আমার জন্য বেশী অসহনীয় কষ্ট হয়, যখন হযরত রসূল (সাঃ)-এর সম্মানের প্রতি আক্রমণ ও বেয়াদবী করা হয়।

সুতরাং হে আমার আকাশের মালিক! তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর, কৃপা দৃষ্টিতে তাকাও এবং আমাদিগকে এমনভাবে ভারী ঈমানী পরীক্ষা থেকে রক্ষা কর।"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ১৫, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, আরবী থেকে অনুবাদ)

আসল আরবী বাক্য যার অনুবাদ উপরে দেয়া হয়েছে তা হল ঃ

"...وما اذى قلبى شيء كاستهزاءهم فى شان المصطفى وجرحهم فى عرض خيرالورى
ووالله لو قتلت جميع صبيانى و اولادى واحفادى باعينى و قطعت ايدى
وارجلى واخرجت الحدقة من عينى - وابعدت من كل مرادى و اونى وارنى ما كان
على اشق من ذلك - رب انظر الينا والى ما ابتلينا......"

সত্যি কথা এই যে, কেহ নিরপেক্ষ মন নিয়ে হযরত সাহেবের রচনাবলী যদি পড়েন, তবে ইহা বুঝা খুবই সহজ যে, من فرق بینی و بین المصطفی ا ماعرفنی وما رأی

"যে আমার ও মুস্তফায় (সাঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে সে আমাকে চিনতেই পারে নি" (খুৎবা ইলহামীয়া)

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) কোন কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বিশেষ করে মাথা ঘুরে যাওয়া। হঠাৎ মাথা ঘুরা আরম্ভ হত। সারা শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেত এবং নাড়ী দুর্বল হয়ে যেত। এমন সময় তাঁর সাহাবাগণ হযরত সাহেবকে শায়ীত অবস্থায় রেখে সেবা-যত্ন করতেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় যা সাহাবাগণ জানতেন, তা এই যে, যদি হযরত রসূল আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিধর্মীদের আরোপিত কোন অপবাদ বা আপত্তি হযরত সাহেবকে শোনানো হত, তখন তাড়াতাড়ি তাঁর শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হত এবং শীঘ্রই তিনি ঐ আপত্তির খণ্ডন করে বক্তৃতা আরম্ভ করতেন। আপত্তির বিষয়বস্তু তাদের মনে তৎক্ষণাৎ উদয় না হলে কোন না'ত বা নযম অথবা কুরআন শরীফের তেলাওয়াত শুনলেও হযরত সাহেব সুস্থ হয়ে উঠতেন।

(ক) (আসহাবে আহ্‌মদ, বর্ণনা হযরত মুনসী জাফর আহমদ (রাঃ) ৪র্থ খণ্ড, রেওয়ায়াত নং ২৪, পৃঃ ১০৭) (খ) সীরাতুল মাহ্‌দী, ২য় খণ্ড, ১৪৬ পৃঃ)

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর দুই দিন আগে 'পয়গামে সুলহে' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি লিখেছেন :

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورہ زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی پر جو ہمیں اپنی جان سے اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے ناپاک حملے کرتے ہیں - ہمیں اسلام پر موت دے ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے -

অর্থ : "আমি সত্য সত্যই বলছি যে, আমরা শুকনো মরুভূমির সাপের সাথে এবং জঙ্গলের হায়েনার সাথে আপোষ করতে পারি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে আপোষ করতে পারি না যারা আমাদের প্রিয় নবীর উপর অন্যায় অপবাদ আরোপ করে। তিনি আমাদের নিজ প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়, আমাদের পিতামাতার চেয়েও বেশী প্রিয়। আল্লাহ্‌ আমাদিগকে ইসলামের মধ্যে মৃত্যু দান করুন, আমরা এমন কাজ করতে প্রস্তুত নহি, যার ফলে আমাদের ঈমান নষ্ট হবার ভয় থাকে। (রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ)

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদী ওঁয়া আলাআলে মোহাম্মাদীন ওয়া বারিক ও সাল্লিম ওয়া আলা আবদিহিল মসীহিল মাওউদ ওয়া আসহাবিহি আযমায়ীন।

[নোট : এ লেখাটি যদিও হুযুর (সা)-এর সীরাত সম্পর্কিত নয় তবুও এ লেখাটি এ সংখ্যায় এ জন্যে দেয়া হল যেন যুগ-ইমাম কি ভাবে সীরাতুন্‌ নবী (সাঃ)-কে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন এবং তাঁকে কিভাবে ভালবাসতেন আমরা যেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

সম্পাদক]

বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহান আদর্শ

মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী

দীর্ঘ ১৩ বৎসর ব্যাপী মক্কার অধিবাসীদের বেদনাদায়ক অত্যাচার মক্কার নিরীহ মুসলমানদের জীবনকে বিপন্ন করে রেখেছিল। তার অবসান হয় যখন ঐশী নির্দেশে মুসলমানগণ তাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু কাফেররা সুদূর মদীনাতেও মুসলমানদেরকে শান্তিতে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে দেয় নি। হিজরী দ্বিতীয় সনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীদের একটা কাফেলা সিরিয়ার পথে রওয়ানা হয়। এই বাণিজ্যিক কাফেলাতে মক্কার প্রায় সকলেই অর্থ বিনিয়োগ করে। উদ্দেশ্য, লাভের অর্থ দ্বারা মদীনার আশ্রিত মুসলমানদের শক্তি সামর্থকে সার্বিকভাবে নির্মূল করে দেয়া এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এই বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে ফিরে আসার পথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা কার্য সম্পাদন এবং তাদেরকে অবরোধ করার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে দুটো অভিযান চালায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ সংবাদ জানতে পেরে বাণিজ্য কাফেলার খবর নেবার জন্য একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কাফেলা মক্কায় গিয়ে এ খবর জানায় এবং আরবদের প্রথানুসারে চিৎকার করলে মক্কাবাসীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সকল প্রকার সমরাস্ত্র সহ মদীনার অভিমুখে রওয়ানা হয়। যাত্রার পূর্বে খানা কাবাতে গিয়ে তারা দোয়া করে, "হে খোদা দু'টো দলের মধ্যে যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের সাহায্য কর এবং মিথ্যাকে লাঞ্ছিত কর।" প্রার্থনা শেষে ১০০০ সুসজ্জিত যোদ্ধা, ৭০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া নিয়ে তারা বদরের প্রান্তরে পৌঁছে।

রসূল করীম (সাঃ) মদীনাতে বসে যথাসম্ভব হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে শত্রু পক্ষের আগমনের সংবাদ পান। কিন্তু রসূল করীম (সাঃ) এই সংবাদ কয়েকজন সাহাবী ছাড়া অন্য কাউকে জানাননি। যে মুহূর্তে রসূল করীম (সাঃ)-এর নেতৃত্বে কাফেলা মদীনা থেকে মক্কাবাসীদের মোকাবেলা করার জন্য বের হবে সেই মুহূর্তে হুযূর (সাঃ)-এর মানসপটে ভেসে উঠল আকাবার দ্বিতীয় বয়াতের (শপথের) কথা। সেই শপথ অনুযায়ী মদীনার মুসলমানরা শুধুমাত্র মদীনাতে থেকেই হুযূর (সাঃ)-এর রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে হুযূর (সাঃ) পরামর্শ চাইলে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) আত্ম বলিদানের প্রতি গভীর সমর্থন ব্যক্ত করেন। কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আনসারদের মুখ থেকে কিছু শোনা। ইহা বুঝতে পেরে হযরত সাদ বিন উবাদা অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক মন্তব্য করেন এবং হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে কুরবানীর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বের হন। তা সত্তেও কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত অন্য সকলেরই ধারণা ছিল যে, তারা বাণিজ্য কাফেলার সাথে

মোকাবেলার জন্য বের হচ্ছেন। সেজন্য অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হল যে, শুধু একটা কাফেলার মোকাবেলার জন্য এত লোকের প্রয়োজন কি? অন্যদিকে যে গুটি কতক সাহাবী জানতেন যে, মক্কাবাসী শত্রুরা একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আসছে, তাঁরা ভাবলেন, শত্রু পক্ষের বিরাট বাহিনীর মোকাবেলায় আমরা স্বল্প সংখ্যক লোক কিভাবে আল্লাহ্‌র রসূলের রক্ষণাবেক্ষণ করব। সে কারণে তারা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূলকে শত্রুর অভিমুখে রওয়ানা হতে দেখে তাঁদের বিচলিত মনোভাব একাগ্রতা, নিষ্ঠা আল্লাহ্‌ নির্ভরতায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) ১২ই রমযান ৩০০ সাথী, ৭০টি উট ও ২টি ঘোড়া নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। যাফরান নামক স্থানে পৌঁছে হুযুর (সাঃ) উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন এবং কোরাইশদের আগমনের কথা ঘোষণা করে তাঁদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। প্রতি উত্তরে নিজেদের সার্বিক দুর্বলতা আঁচ করতে পেরে কিছু লোক বললেন, আমরা শুধু বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখী হব। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তা পসন্দ করলেন না। তখন নিবেদিতপ্রাণ প্রধান প্রধান সাহাবারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র রসূলের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন। মোহাজের হযরত মেকদাদ বিন আমর বললেন, "আমরা মূসার (আঃ) সাথীদের মত বলব না, হে মূসা তুমি এবং তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর বরং আমরা আপনার ডানে, বামে ও পশ্চাতে লড়ব। হুযুর (সাঃ) এই উত্তরে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। হুযুর (সাঃ) আনসারদের পক্ষ থেকেও কিছু মতামত পাওয়ার আশা করেছেন, ইহা অনুধাবন করে হযরত সাদ বিন মায়ায (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনাকে একজন সত্যিকার নবী হিসেবে বিশ্বাস করেছি, আপনার হাতে হাত রেখেছি। আপনি যেথায় ইচ্ছা যান আমরা আপনার সাথে আছি। যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা সানন্দে ঝাঁপ দেব। আপনার যে কোন আদেশ পালনে আমরা পিছপা হব না। আপনি আমাদের সত্যবাদী পাবেন এবং আমাদের কার্য আপনার খুশীর কারণ হবে। আনসারদের পক্ষ হতে এই উত্তর শুনে হযরত (সাঃ) যার পর নাই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্‌র নামে অগ্রগামী হও এবং আনন্দিত হও যে, খোদাতা'লা আমাকে নিশ্চিত বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন। আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, শত্রুর শিরোমণি আজ টুকরো টুকরো হবে।"

হুযুর (সাঃ) রণক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করলেন। রণক্ষেত্রের ঘটনাবলী হুযুর (সাঃ)-এর সীরাতের (চরিত্রের) আলোকে বর্ণনা করব। কেননা বদরের যুদ্ধের তাৎপর্য অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়। সে কারণেই এই পটভূমির অবতারণা। তাই এখানে বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিস্থিতি ও রসূলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী একে একে উপস্থাপন করা হল :

(১) বদরের উপত্যকায় পৌঁছবার পর মক্কাবাসীদের উপস্থিতি জানতে পেরে হুযুর (সাঃ) কয়েকজনকে গোয়েন্দা কার্যে নিযুক্ত করেন। গোয়েন্দারা একজন নিগ্রোকে ধরে নিয়ে এসে ওদের বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন। উত্তর না দেয়াতে তারা

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হন। হুযূর (সাঃ) তখন দোয়ারত অবস্থায় ছিলেন। দোয়া সেরে তিনি সাহাবাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা নিতে বাধা দেন এবং অত্যন্ত কোমল এবং স্নেহ ভরা কণ্ঠে তাকে মক্কার সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে জানতে চাইলে সে সবকিছু নির্দ্বিধায় বলে দেয়। কুরআনও রসূল করীম (সাঃ)-এর পন্থা ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়। খোদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পন্থাকে রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং কোমল ব্যবহারকে কার্য সিদ্ধির উত্তম উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

(২) হুযুর (সাঃ)-এর চরিত্রের আরো একটা দিক ছিল তার বুদ্ধিমত্তার অপূর্ব ব্যবহার। যেমন, সেই নিগ্রোর কাছে মক্কাবাসীদের মোট লোক সংখ্যা জানতে চাইতে সে অজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন হুযুর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞসে করলেন যে, তারা দৈনিক কয়টা উট যবহ করে? প্রতি উত্তরে সে বলল, ৯টা থেকে ১০ টা। হুযুর (সাঃ) বললেন, তাদের সংখ্যা প্রায় ১০০০ হবে এবং প্রকৃত সংখ্যা ইহাই ছিল।

(৩) যুদ্ধ ময়দানে যোদ্ধাদের মনোবলকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার অসাধারণ গুণাবলীও তাঁর মধ্যে ছিল। যেমন নিগ্রোর নিকট যুদ্ধে আগত কোরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের নাম জানতে চাইলে, সে নামগুলো অকপটে বলে দিল। এ সময় রসূল করীম (সাঃ) যে মন্তব্য করেন তা অসাধারণ। হ্যাঁ, এ মন্তব্য সাহাবাদের অশেষ মনোবল বৃদ্ধির কারণ হয়। তিনি বল্লেন, "মক্কা তোমাদের সামনে তার লিভার বা যকৃতগুলিকে উপস্থাপন করেছে।" এ কথা শুনে সাহাবারা বুঝলেন তারা একটি যোদ্ধা দলের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। তাদের আশংকা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাচন-ভঙ্গীতে অদম্য মনোবলে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারা বল্লেন, "খোদাতা'লা মক্কার সর্দারদের বের করে এনেছেন আমাদের হাতে ধ্বংস হওয়ার জন্য।"

(৪) সাহাবাদের পরামর্শকেও তিনি উপেক্ষা করতেন না। যুদ্ধের সময় অবস্থান এবং স্থান নির্ণয় সম্পর্কে হাবিব বিন মুনয়েব বললেন, "হুযুর! যে স্থান মুসলমানদের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে তা সঠিক মনে হচ্ছে না। হুযুর (সাঃ) বল্লেন, "তুমি কি কোন প্রস্তাব দেবে?" তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে অন্য স্থান দেখিয়ে দিলে, হুযুর (সাঃ) তা গ্রহণ করলেন। ইহা ছিল হুযুর (সাঃ)-এর চরিত্রের আর একটি আকর্ষণীয় দিক।

(৫) নিজের দুর্বলতার সময় মানুষ যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চারে যত্নবান হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) নীতিকে সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যখন হোসায়ফা বিন ইয়াসামা এবং আবু জাবাল মক্কা থেকে মদীনায় এসে হুযুর (সাঃ)কে বললেন "আমরা মক্কা থেকে আসছি। কিন্তু আসার সময় কোরাইশরা আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে এবং শুধু এই

শর্তে ছেড়েছে যে, আমরা যেন মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ হতে বিরত থাকি। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, "তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, আমরা শুধু আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর উপরই ভরসা করি!"

(৭) শত্রুদের প্রতিও তিনি দয়াবান ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে ঝর্ণার উপর আধিপত্য ছিল মুসলমানদের। কোরাইশরা যখন পানি নিতে আসে, তখন সাহাবারা বাধা দিলে, রাহমাতুল্লীল আলামীন বললেন, "শান্তিতে পানি নিতে দাও।"

(৮) কৃতজ্ঞতাবোধ যা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তা শত্রুর বেলায়ও তিনি অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর যুদ্ধ-নীতি যা আমরণ প্রবহমান ছিল তা হল এই যে, প্রথমে আক্রমণ করবে না এবং আমার অনুমতি ছাড়া তীর চালনা করবে না। তিনি আরও বল্লেন যে, শত্রু পক্ষের কিছু লোক বাধ্য হয়ে ময়দানে এসেছে, যেমন আব্বাস। এমন অনেকে আছেন যাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিৎ যেমন আবুল বখ্‌তরি। যদি কোন মুসলমান তাদের পায়, তাহলে যেন দয়া প্রদর্শন করেন। অনুরূপ মন্তব্য মুতেমবিন আদি সম্পর্কেও করেন যে, যদি সে জীবিত থাকতো এবং বদরের বন্দীদের জন্য সুপারিশ করতো তাহলে আমি সকলকে ক্ষমা করতাম।

(৯) অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে পথ নির্দেশনা রয়েছে যে, যত্ন করে তীর ব্যবহার করবে, বৃথা নিক্ষেপ করবে না। তলোয়ার শুধু হাতাহাতি যুদ্ধের সময় ব্যবহার করবে।

যাই হোক প্রথমে একক যুদ্ধ হল এবং পরে সম্মিলিত যুদ্ধ। খোদাতা'লা উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের অসাধারণ বিজয় দিলেন। মক্কাবাসীদের বড় বড় সর্দারই ধ্বংস হল এবং খোদার প্রতিশ্রুতি—"অবিশ্বাসীদের মূল কেটে দেয়া হবে (৮ : ৮)" তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হল।

(১০) যুদ্ধের শেষে বন্দী এবং মৃত দেহের সাথেও তিনি মানবিক আচরণ অব্যাহত রাখেন। মৃতদের সম্পর্কে এই আদেশ দেন যে, কোন মৃত দেহকে যেন অংগচ্ছেদ না করা হয়। ইতিপূর্বে সকল যুদ্ধবন্দীকে হত্যার নীতি জারী ছিল। কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) তাদের সাথে মানবিক আচরণ করেন। নিজেরা না খেয়ে তাদের খাওয়ান। নিজেরা না পরে তাদের পরিধান করান। অনেককে নিঃশর্ত ভাবে মুক্তি দেন, আবার অনেককেই শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দান করেন। বন্দীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার পূর্বের ইতিহাসে নেই।

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রের এই রকম আরও অনেক মনোরম দিক রয়েছে যা এই যুদ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকল কিছু পর্যালোচনা সম্ভব নয়। আর একটা দিক যা উল্লেখ না করলে এ লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যাবে।

মুসলমান এবং কাফের, সকলের জন্যই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে এই যুদ্ধ একটি মাইল ফলক। শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয় বরং সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের একটি অসাধারণ প্রভাব আছে। স্যার উইলিয়াম মুইর বলেন, "বদরের যুদ্ধে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেগুলিকে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্বপক্ষে (আল্লাহ্‌র) বিশেষ সাহায্য বলে উপস্থাপন করার অধিকার রাখেন।

এই মন্তব্য ছিল একজন বিধর্মীর। তিনি যতটুকু বুঝেছেন, যতটুকু অনুধাবন করতে পেরেছেন, ততটুকুই বলেছেন! কিন্তু প্রকৃত বিষয় আরও বড়, আরও মহান ও সুদূর প্রসারী। আমাদের খোদা আজও জীবিত। আজও কথা বলেন। আজও সত্যের সাহায্যের জন্য অনুরূপ আত্মাভিমান রাখেন। যদি আমরা নিজেদের মনকে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করি, তাহলে আজও তিনি শত্রুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে অনুরূপ সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সৈয়েদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর
নারী জাতির উপর অনুগ্রহ

মাসুদা সামাদ

আমাদের পরম প্রিয় মহানবী হযরত খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ মুস্তফা আহ্‌মদ মুজতাবা (সাঃ)-এর অনুগ্রহ ও এহসান সমগ্র মানজাতির উপরেই রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সমস্ত জগতের জন্য رحمة للعالمين রাহ্‌মাতুলল্লীল আলামীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি سراج منير অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় সমগ্র বিশ্বকে তাঁর কল্যাণ ও রহমত দ্বারা বেষ্টিত করে রেখেছেন এবং তিনি সবাইকে কল্যাণ দান করে যথার্থই 'রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন' প্রমাণিত হয়েছেন। اللهم صل وسلم عليه

নারী জাতির উপর তাঁর যে অনুগ্রহ ও মেহেরবানী ছিল তাও অসীম। আমি এখানে সামান্য কিছুটা উল্লেখ করে ধন্য হতে চাই।

সব চেয়ে প্রথম এবং প্রধান অনুগ্রহ ও সম্মান যা তিনি নারীকে দান করলেন, তা হলো তাকে মায়ের সম্মানীত আসনে বসিয়ে ঘোষণা করলেন الجنة تحت اقدام امهاتكم অর্থাৎ তোমাদের মায়ের পায়ের নীচে তোমাদের জান্নাত রয়েছে। এর অর্থ এই যে, মায়ের সুশিক্ষায় ও সু শাসনের ফলে সন্তান জান্নাত পাবার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। সমাজে শান্তি ও জান্নাত প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সন্তানকে মায়ের আদেশ নির্দে'শ মেনে চলতে হবে! এতে করেই শান্তি আসবে সমাজের ঘরে ঘরে।

একদা এক সাহাবী আঁ-হযরত (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সর্বোচ্চ ব্যবহার পাবার হকদার কে? হুযুর (সাঃ) উত্তরে বল্লেন "তোমার মা"—তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন "তার পর?" হুযুর উত্তর দিলেন "তোমার 'মা'। তৃতীয়বারও বল্লেন, 'মা' এর পর জিজ্ঞেস করাতে হুযুর বল্লেন, "এর পর তোমার বাবা।

আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের পৃথিবীর তিনটি জিনিস আমার খুব প্রিয় খুশবু, নারী জাতি এবং নামায। তবে আমি আসল শান্তি নামাযে অর্থাৎ প্রভুকে স্মরণ করার মধ্যেই পেয়ে থাকি।" হুযুর (সাঃ) মেয়েদেরকে বড়ই ভাল বাসতেন, সম্মান করতেন, ভাল ব্যবহার করতেন ও করতে আদেশ দিতেন। বলেছেন, خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজ পরিবারের বা স্ত্রীর জন্য ভাল। জেনে রাখ, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাকি।

আরও কত রকমেই না আঁ-হযরত (সাঃ) নারীর মর্যাদা ও সম্মান কায়েম করেছেন। বিয়েতে মেয়ের মতামত নিতে হবে। মোহ্‌রানা দিতে হবে! মা বাবা ও স্বামীর সম্পদে নারীর অধিকার ও হক দিলেন। বিদায় হজ্জে বিশেষ করে স্ত্রীদের প্রতি ভাল আচরণ করতে নির্দে'শ দিলেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে উপদেশ দিয়ে গেলেন।

আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানে মেয়েদেরকে প্রত্যেক পুণ্যের কাজে সমান অংশীদার করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে হুযূর (সাঃ) ঘোষণা করে দিলেন,

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات ... الخ

এখানে আল্লাহ্‌ পসন্দ করেন এমন দশ রকমের গুণীর উল্লেখ রয়েছে। এর প্রত্যেকটি গুণেই মেয়েদেরকে পুরুষের পাশাপাশি বর্ণনা করাতে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। কুরআন আরো ঘোষণা করেছে,

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة

পুরুষ বা নারী ঈমান আনার পর যদি সময় উপযোগী পুণ্য কাজ করে সে যে-ই হোক না কেন, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এখানেও নর ও নারীকে একই পর্যায়ে রাখা হয়েছে। নারীর প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে সামনে রেখে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে বলেছেন। আমাদে প্রিয় নবী (সাঃ) স্ত্রীর যদি খারাপ দিকটা দেখতে পাও তবে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাল গুণগুলিও দেখবে। তাতে তার প্রতি তোমার মনের ভাবটা নম্র হবে। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে নিষেধ করেছেন। চরিত্র খারাপ হলে বা বেশী বাড়াবাড়ি করলে শাসনের জন্য পায়ের দিকে হাল্কা আঘাত করা যেতে পারে — মুখে কখনও নয়—এ হেন শিক্ষা বা নির্দেশ ছিল আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর।

ইসলামের পূর্বে নারীকে কোন দামই দেয়া হতো না। আমাদের নবী (সাঃ)-ই নারী জাতির ত্রাণকর্তা। সুশিক্ষা গ্রহণ পুরুষ ও স্ত্রী লোক এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দ্ধারণ পূর্বক বাবা-মার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

আরো বলেছেন, যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে আছে এবং সে তাদেরকে ভাল শিক্ষা দান করে ভাল পাত্রে প্রাত্রস্থ করে সে জান্নাতে যাবে। মহানবী (সাঃ) নারীকে সব রকম হক বা দাবী আদায়ের অধিকার দিয়ে গেছেন যেমন ঃ

১। পূর্বে উল্লেখিত বিয়ের সময় মেয়ের সম্মতি নেয়া একান্ত আবশ্যক। মেয়ের সম্মতি ছাড়া বিয়ে হতে পারে না।

২। নারীকে ঘরের রাণী নির্দ্ধারণ করে সম্মানিত করেছেন। তার পরিধির (সীমানা) মধ্যে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। একজন সাহাবী বল্লেন, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি এবং আমার মা এক বাড়ীতে থাকি। আমাকেও কি বাড়ীতে ঢুকার সময় অনুমতি নিতে হবে? হুযূর (সাঃ) বল্লেন, 'হ্যাঁ', কারণ তোমার মা সব অবস্থাতেই তোমার সম্মুখে আসতে পসন্দ করবেন না, সুতরাং অনুমতি নেয়া দরকার।''

মা বাবার ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদেও পুরুষের মত নারীর অধিকার রয়েছে। আঁ-হযরত (সাঃ) নিজে নারীর প্রতি উত্তম ও সদয় আচরণ করে ও নির্দেশ দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন এবং আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। একদা উটের উপর মহিলারা উপবিষ্ট ছিলেন। চালক জোরে উট চালাচ্ছিল। হুযুর বল্লেন, "ধীরে ধীরে চালাও; উটের উপর কাঁচ আছে ভেঙ্গে যাবে।" নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে সমান ও সুন্দর ব্যবহার করে তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কন্যাকে অতিশয় স্নেহ করতেন ও তার খোঁজ-খবর নিতেন।

সফরে যাওয়ার সময় সব চেয়ে শেষে কন্যার সঙ্গে দেখা করতেন এবং ফেরার পর সব চেয়ে আগে দেখা করতেন — যাতে দূরে থাকার সময়টা কমে যায়।

আমরা দেখতে পাই, হুযুর (সাঃ) শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বক্ষেঃ মাথা রেখে। হযরত ফাতেমা হুযুরের কষ্ট দেখে কেঁদে ফেল্লেন। তখন তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে কি যেন বল্লেন। ফাতেমা তাতে আনন্দিত হলেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম জীবন সঙ্গিনী। তাঁর মৃত্যুর পরও তিনি তাঁকে কোন দিন ভুলতে পারেন নি। তাঁর কোন আত্মীয় ও বন্ধুদেরকে কোরবানীর মাংস ও নানা রকম তোহ্‌ফা পাঠিয়ে আত্মীয়তা রক্ষা করতেন। এ বিষয় তিনি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হযরত খাদীজার বোন "হালা" দীর্ঘকাল পর একবার হুযুরের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত খাদীজার গলার মত গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন ও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভুল ভেঙ্গে যাওয়াতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বল্লেন, "ওহো! ইনিতো "হালা"

হযরত খাদীজার প্রতি পবিত্র ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন সতীনের প্রতি আমার হিংসা হয় নি। কিন্তু মরহুমা হযরত খাদীজার প্রতি একটু হয়েছিল, তা আমি স্বীকার করছি। দুধ-মা গ্রামের মহিলা হালিমা যখন হযরতের (সাঃ) নবুওয়াত লাভের পর আসতেন, হুযুর (সাঃ) নিজের চাঁদর তার জন্য বিছিয়ে দিতেন এবং আনন্দিত হয়ে বলতেন, "আমার মা, আমার মা।"

নারীকে এত সম্মান যিনি দিলেন, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য তাঁর মহিমা গাওয়া, তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। তাঁর প্রতি হাজার হাজার বার প্রতিদিন দরূদ শরীফ পড়া। তাঁর শিক্ষার উপর আমল করা। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করা।

وہ رحمت عالم آتا ہے - تیرا حامی ہو جاتا ہے - سب حق تجھ دلواتا ہے
ان ظلموں سے چھڑواتا ہے
بھیج درود اس محسن پر تو دن میں سو سو بار
پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار -

আল্লাহুম্মা সাল্লাআলা মুহাম্মাদি ওঁয়া আলাআলে মুহাম্মাদিন ও বারিক ও সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

জেহাদ বিল্ কুরআন

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে যে সব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ও প্রচার হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে তার অন্যতম উৎস হচ্ছে জেহাদ। ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে একটা বিকৃত ধারণা পোষণ করতেন পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিরোধী লেখকরা এবং সেই ধারণাটা তারা তীব্র বিদ্বেষের কালিতে লিখে লিখে প্রচার করতেন। পাশ্চাত্যের সেই ভ্রান্ত বিদ্বিষ্ট চিন্তা শুধু যে তথাকার মন ও মানসকেই মসীলিপ্ত করেছে তা নয়, সেই চিন্তাটা পাশ্চাত্য দর্শন প্রভাবিত এ জগতের অর্থাৎ প্রাচ্যেরও মন মানসিকতাকে মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করেছে। এই মারাত্মক বিভ্রান্তি থেকে, এমনকি, মুসলিম মন মানসও মুক্ত নয়। বরং তা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর মারাত্মক, যার দৃষ্টান্ত আমরা পরে পেশ করবো। হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সারা জীবন জেহাদ করেছিলেন — কিন্তু সে জেহাদ তিনি করেছিলেন আল্লাহ্-তা'লার নির্দেশে কুরআন করীম দিয়ে এবং প্রয়োজনে আত্মরক্ষার্থে তরবারি বা অস্ত্র দিয়েও। পবিত্র কুরআন দ্বারা যে জেহাদ সেটাই মুখ্য এবং সেটাই বড়। অস্ত্র দ্বারা যে জেহাদ সেটা গৌণ এবং ছোট। মুখ্য যেটা সেটাই আসল এবং গৌণটা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু মুসলিম নসীবের নির্মম পরিহাস এই যে, এই নিম্নস্তরের গৌণটাই হয়ে উঠেছে প্রধান ও মুখ্য এবং উচ্চস্তরের মুখ্যটাই হয়ে গেছে অপ্রধান ও গৌণ। এবং শুধু জেহাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, ইসলামী শিক্ষার আরও অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তা-চেতনা আজ উল্টো দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে মুসলিম উম্মাহ্ এখন তাদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উন্নতি বা রা'ফা লাভের আশায় প্রায় দু'হাজার বছরের পূর্বেকার কুরআন ঘোষিত মৃত এক নবীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

জেহাদ সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লার চিরন্তন ঘোষণা হচ্ছে :

فلا تطع الكفرين وجاهدهم به جهادا كبيرا

'অতএব, তুমি কাফেরদের আনুগত্য করিও না, এবং তুমি এর (কুরআনের) সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে বৃহৎ জেহাদ কর।' (২৫ : ৫৩)।

এই আয়াতে করীমায় 'জেহাদে কবীর' বা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ যে জেহাদের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কুরআন পাকের বাণীর প্রচার এবং তার আদর্শের বা শিক্ষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। আর এটাই হচ্ছে আসল ও প্রকৃত জেহাদ। সুতরাং, আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিস্তারে সাধারণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা এবং তার শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নামই জেহাদ। এবং এই জেহাদকে সুসংগঠিতরূপে অবিরাম নিরলসভাবে অব্যাহত রাখার জন্য তাকিদ রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। আল্লাহ্তা'লার একত্ব

বা তৌহীদ প্রতিষ্ঠাই এই জেহাদের মূল লক্ষ্য। এই পবিত্র লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য জান মাল ইজ্জত-ওয়াক্ত দিয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সংগ্রাম করে যেতে হবে মুসলমানকে। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে এবং আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত করার পথে অহেতুক বাধা সৃষ্টিকারীকে প্রতিহত করতে হবে। অহেতুক এই বাধা দানকারীদের বা বিরুদ্ধবাদীদের ফিৎনা-ফাসাদ দূরীভূত করে শান্তি প্রতষ্ঠার খাতিরে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া বিধর্মীদের আক্রমণ অর্থাৎ ধর্মের নামে যারা অস্ত্র ধারণ করে বা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে যারা অস্ত্র ধারণ করে, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে প্রতিহত বা পরাভূত করার জন্যও মুসলমানদের অস্ত্র ধারণ করতে হবে বা যুদ্ধ করতে হবে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে এইরূপ যুদ্ধকেই সাধারণভাবে বলা বলা হয় ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ। তবে, এই শ্রেণীর যুদ্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর জেহাদ। এজন্যই হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এই শ্রেণীর এক জেহাদ থেকে ফেরার পথে বলেছিলেন : আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি।

আঁ-হযরত (সাঃ) বর্ণিত এই বড় জেহাদের একটি রূপ হলো আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম। নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই সর্বাপেক্ষা বড় সংগ্রাম। এছাড়া, আঁ-হযরত (সাঃ) এ কথাও বলেছেন যে, অত্যাচারী বাদশাহ্‌ বা শাসনকর্তার মুখের উপরে নির্ভয়ে সত্য কথা বলে দেয়ার নামও, জেহাদে আকবর। সুতরাং, ধর্মের জন্য তরবারি বা অস্ত্রের যে যুদ্ধ, সাধারণ অর্থে যাকে ধর্ম যুদ্ধ বলা হয়, তা হচ্ছে ছোট জেহাদ। এই শ্রেণীর জেহাদ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত হয়েছিল এবং স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) এইসব জেহাদের অনেকগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সব জেহাদে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) যে সকল নীতি-নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন, তা সবই ছিল কুরআন প্রবর্তিত নীতিমালা। এই শ্রেণীর জেহাদ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে :

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٥

'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করবার) অনুমতি দেয়া হলো কেননা তাদের উপরে যুলুম করা হচ্ছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদেরকে (মযলুমদেরকে) সাহায্য করতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান।' (২২ : ৪০)।

আলেমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ধর্ম-যুদ্ধ বা জেহাদ সম্পর্কে এটাই প্রথম আয়াত যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আত্ম রক্ষার্থে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি দান করা হয়েছে। মক্কা নগরীতে ক্রমাগত ভাবে তের বৎসর যাবৎ অকথ্য যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছিলেন স্বয়ং রসূলে পাক (সাঃ) এবং তাঁর নির্দোষ সাহাবীরা (রাঃ)। এইসব নযীরবিহীন নিষ্ঠুর যুলুম ও অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁরা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন মদীনাতে। কিন্তু সেখানেও শত্রুরা তাঁদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। অনবরত মদীনাবাসী মুসলমানদের উপরে মক্কার শত্রুরা আক্রমণ চালিয়ে যেত,

মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত অনুমতি দেয়া হয় মুসলমান-দেরকে আত্মরক্ষার জন্যে। এইরূপ অনুমতি দানের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে :

الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ط ولولا دفع الله الناس
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ط
ولينصرن الله من ينصره ط ان الله لقوى عزيز ٥

যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদের রব্ব্ — প্রভু প্রতিপালক।' আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয়, এবং মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, (সেগুলো) অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলা হতো। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর (ধর্মের পথে) সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।' (২২:৪১), এই আয়াতে ধর্মযুদ্ধের জন্য অনুমতি দানের অপর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে কোন প্রকার বৈধকারণ ছাড়াই অন্যায়ভাবে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এরূপ দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের একমাত্র অপরাধ (দুশমনদের দৃষ্টিতে) ছিল এটাই যে, তারা বলতো 'এক আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। মুসলমানরা বছরের পর বছর ধরে মক্কায় নির্যাতিত হয়েছিল, অতঃপর সেখান থেকে তারা তাদের স্বদেশ থেকে, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। অগত্যা মদীনায় হিজরত করলো তারা। কিন্তু সেখানেও তাদেরকে শান্তিতে নিরাপদে বসবাস করতে দেয়া হলো না। মদীনার চারিদিকের আরব উপজাতিগুলোর সংঘবদ্ধ আক্রমণ দ্বারা ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো। কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কোরেশদের যে বিপুল প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, তা তারা সর্বাংশে কাজে লাগালো। খোদ মদীনাতেও ছিল বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা। ইহুদীরাও ঐক্যবদ্ধ হলো ? এবং তাদের বিরোধিতাও বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এইরূপ এক ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা নিজেদের ঈমান-আমল, জান-মাল এবং বিশেষতঃ তাদের প্রাণাধিক প্রিয় রসূলে পাক (সাঃ)-এর রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যে সকল কারণে অধিকার জন্মে তার সবগুলিই তখন সৃষ্টি হয়েছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লা-মের জন্য এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জন্য।

এই আয়াতে ইসলামে অস্ত্রযুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এই শ্রেণীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, অপর জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়ীঘর, বিষয়-সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করা এবং তাদের বিদেশী শক্তির পদানত করা বা গোলামে পরিণত করা। যুদ্ধের উদ্দেশ্য এটাও ছিল না যে, বিদেশে বাজার

আবিষ্কার করা বা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা, শোষণ করা যেমনটা করেছে আধুনিক পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো। বরং এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল—আত্মরক্ষা করা, ইসলামকে রক্ষা করা এবং এই যুদ্ধ ছিল বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ, চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধির মুক্তি প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সেইসঙ্গে এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, অন্যান্য ধর্মের উপাসনা-লয়গুলোকে মঠ-মন্দির, আশ্রম, সিনাগগ্, গীর্জা প্রভৃতিকে রক্ষা করা। এই যুদ্ধ বা জেহাদ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা আরও বলেছেন,

'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্‌র জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর, যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে কারও বিরুদ্ধে কোনও শত্রুতা নেই। কেবলমাত্র যালেম ছাড়া। (২:১৯৪; ও ৮:৪০)।

এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানকে যুদ্ধ করবার অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয়েছে যখন বিরোধী শক্তি তাদের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এবং যুদ্ধ ঐ সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলেই যুদ্ধ থামিয়ে দিতে হবে। এজন্যই হযরত রসূল আকরাম (সাঃ) অনেক গুলি সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যদি খোদাতা'লার নির্দেশ এরূপ হতো যে, অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, তাহলে আঁ-হযরত (সাঃ) কখনই ঐ সব সন্ধি স্থাপন করতেন না। কিংবা 'জিজিয়া' কর দানের শর্তে যুদ্ধ বন্ধ করতেন না। যেমন বলা হয়েছে:

'যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্‌র উপর ও পরকালের উপর ঈমান আনে না, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম বলে গণ্য করে না, এবং তারা সত্য ধর্মকে অবলম্বন করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা অধীনস্থ হয়ে স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়'—' (৯:২৯)।

এই আয়াতেও আহলে কিতাবদেরকেও যুদ্ধ করে জবরদস্তি মুসলমান বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং আনুগত্য স্বীকার করলে তাদেরকেও নিরাপত্তার সহিত স্বাধীনভাবে তাদের নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। তখন এই সকল অমুসলিমদেরকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হতো। দেশ রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাদেরকে যে কর দিতে হতো সেটাই জিজিয়া। মোট কথা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা ইসলামী বিধান মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে:

'ধর্মে বল প্রয়োগ নেই।' কেননা—সৎপথ ও ভ্রান্তি—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।' (২:২৫৭)

(ক্রমশঃ)

মক্কা বিজয়

মাওলানা সালেহ্ আহমদ
সদর মুরব্বী

চৌদ্দ শতাব্দী গত হবার পরও আজ যখনই হযরত নবী করীম (সাঃ) এর নাম উচ্চারিত হয়, প্রতিটি মোমেনের হৃদয়ে যেন ঢেউ খেলে যায়; এক মূর্তিময় স্নেহ, আশীষ ও কল্যাণের অবয়ব চোখের সামনে ভেসে উঠে। সেই আদর্শ মানব (সাঃ)-কে ~~আমরা~~ আমরা কেউ স্বচক্ষে দেখি নি। কিন্তু তাঁর (সাঃ) পবিত্র জীবনের ইতিবৃত্ত যখন আদ্যোপান্ত স্মরণ করি, তখন মনে হয়, তাঁকে যেন স্বচক্ষে অবলোকন করছি। আজ তাঁর জীবনের এমন একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার বিবরণ দিব, যার সদৃশ ঘটনা মানব ইতিহাসে বিরল। ইহা হল মক্কা-বিজয়ের অনন্য ঘটনা।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো মনে মনে আওড়িয়ে, যখন মক্কাবাসীগণ মনে করল, এই সন্ধি মুসলমানদের জন্য একটি পরাজয়ের কালিমা বিশেষ, এবং সাহাবা (রাঃ)-এর হৃদয়ও যখন এই ঘটনায় চৌচির, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ্তা'লা হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে সুসংবাদ দিলেন:

أنا فتحنا لك فتحا مبينا ٥

অর্থাৎ আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করিলাম। অর্থাৎ এই হুদায়বিয়ার সন্ধিই তোমাদের বিজয়ের ভিত্তি।

হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বনু খুযা'আ গোত্র হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বনু খুযা'আর বিরোধী গোত্র বনু বকর কুরায়েশদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের দলীল করে। গোত্রটির মধ্যে বহু দিন যাবৎ যুদ্ধ চলছিল। ইসলামের বিকাশের পর যুদ্ধ ও কলহে ভাটা পড়ে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কুরায়েশদের দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ হলো। সন্ধির ফলে তারা ক্রমাগত যুদ্ধের অনল থেকে মুক্ত হয়ে একটা স্বস্তির মাঝে দিন কাটাবার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু বনু বকর মনে করল যে, কুরায়েশগণ নিশ্চয় তাহাদিগকে সাহায্য করবে। এই ভেবে তারা অকস্মাৎ বনু খুযাআর উপর আক্রমণ করল এবং বহু ক্ষতি সাধন করল। বনু খুযাআ নিরুপায় হয়ে হেরেম শরীফে আশ্রয় নেয়। হেরেমের মর্যাদা বনু বকরকে ক্ষান্ত করল। কিন্তু "নওফেল" নামক এক সর্দারের ইঙ্গিতে, বনু বকর বনু খুযাআর উপর শেষ আক্রমণ করে বসল, হেরেমের ভেতরই। বনু খুযাআর লোকদিগকে তারা সেখানেই হত্যা করল, বনু খুযাআর কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় উপস্থিত হয়ে হুযুর (সাঃ)-কে তাদের অবস্থা বর্ণনা করল। তিনি (সাঃ) দূত মারফৎ কুরায়েশদের নিকট তিনটি শর্ত পেশ করলেন। (১) যুদ্ধে নিহতদের রক্তপণ দেয়া হোক, (২) কুরায়েশ বনু বকরের সাহায্য দান হতে

বিরত হোক, (৩) নতুবা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে দেয়। কুরায়েশদের তরফ হতে সন্ধি ভঙ্গের শর্তটি মেনে নেয়ার ঘোষণা দেয়া হলো।

এর মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মক্কাবাসীদের সন্ধি ভঙ্গ ও অন্যান্য প্রকারের সীমা লঙ্ঘনের দরুণ মক্কা আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান (কোন রেওয়ায়াতে আছে ১৮ই রমযান) দশ সহস্র সৈন্য সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এরই মধ্যে কুরায়েশগণ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর অভিযানের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য হাকেম বিন হেযাম, আবু সুফিয়ান ও বুদেল বিন ওরাকাকে পাঠালো। খোঁজ করতে এসে আবু সুফিয়ান ধৃত হন। গ্রেফতার হবার পর তিনি ঈমান আনেন। যখন বিশ্রামের পর সৈন্যদল অগ্রসর হবার জন্য যাত্রা শুরু করল তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) কে আদেশ দিলেন যে, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাহিনীকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। দুইশত ষাট মাইল অতিক্রম করে কোন এক সন্ধ্যায় হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কার নিকটবর্তী এক উপত্যকায় অবস্থান নিলেন। কুরায়েশগণ ভাবতেই পারে নি যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) হঠাৎ করে এত বড় সৈন্যদল নিয়ে পৌঁছে যাবেন। আবু সুফিয়ান বলে উঠল, "হে মুহাম্মদ (সাঃ) এত সৈন্যবল নিয়ে এসে কি তোমার স্বজাতি ও জাতিবর্গকে নিধন করবে? এতে কি মক্কার বুকে প্রসিদ্ধ কুরায়েশ কুল শূন্য হয়ে যাবে না?' অপরদিকে আনসারদের পতাকা বাহী সাআদ বিন উবাদা বলে উঠল,

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة

অর্থাৎ আজ ঘোর যুদ্ধের দিন; আজ কা'বাতে (নর হত্যা) হালাল হবে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, হে আবু সুফিয়ান! আমি নরহত্যা বা কুরায়েশ কূলকে ধ্বংস করতে আসি নি। আজ তো কাবার মর্যাদার দিন। উবাদা ঠিক বলছেন। "হুজুন" নামক স্থানে ইসলামের পতাকা উড়ানোর পর হুযুর (সাঃ) ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে অথবা আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিবে অথবা ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। যারা হাকেম বিন হুযামের পতাকা তলে একত্রিত হবে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। আবি রুবেয়হা, যাকে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বেলালের ভাই বানিয়ে ছিলেন, তার হাতে পতাকা দিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেলালকে বল্লেন, তুমি ঘোষণা দাও, যে ব্যক্তি আবি রুবেয়হার পতাকা তলে আসবে, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। আবু সুফিয়ান, যে মুসলমানদের অবস্থা দেখতে এসেছিল সে মক্কা গিয়ে ঘোষণা দিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সৈন্যদল সহ এসেছেন। তিনি (সাঃ) তোমাদিগকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং তার শর্তসমূহ এইরূপ। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা আবু সুফিয়ানের দাঁড়ি ধরে টানল এবং চীৎকার করতে লাগলো, হে মক্কাবাসীগণ! এসো এবং এই বুড়ো গর্দভকে হত্যা কর। আবু সুফিয়ান বলল, 'কথা বলার সময় আর নেই।'

আমি ঐ সৈন্যদল দেখে এসেছি যার মুকাবেলা করার শক্তি গোটা আরবেরও নেই। অতঃপর আবু সুফিয়ান নিরাপত্তার শর্তসমূহ পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। মক্কাবাসী দৌড়ে দৌড়ে নিরাপত্তার স্থান খুঁজতে লাগলো। এগারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হল। এদের সম্বন্ধে নবী করীম (সাঃ) হত্যার আদেশ দিয়েছেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ ছিল যে, মক্কার কেউ যুদ্ধ না করলে, যেন তাদেরকে আক্রমণ করা না হয়। যেই দিক হতে খালেদ বিন ওয়ালিদ প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে কিছু লোক প্রতিরোধ গড়ে তুললে, হামলায় ২৪জন লোক নিহত হয়।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর উটের লাগাম ধরে ছিলেন এবং হুযুর (সাঃ) সূরা ফাতাহ'র আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছিলেন, তিনি সোজা খানা-কা'বায় আসলেন এবং উটের উপর চড়েই সাতবার তাওয়াফ করলেন। অতঃপর কা'বায় রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোর উপর আঘাত করছিলেন আর কুরআনের আয়াত পাঠ করছিলেন:

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

অর্থাৎ সত্য এসে গিয়েছে এবং মিথ্যা বিতাড়িত হয়েছে! নিশ্চয় মিথ্যা বিতাড়িত হওয়াই নির্ধারিত ছিল। যখন হযরত রসূল করীম (সাঃ) সবচেয়ে বড় মূর্তি "হুবল" কে ভাংলেন হযরত যুবাইর হেসে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু সুফিয়ান তোমার কি মনে আছে ওহুদের যুদ্ধে যখন নবী করীম (সাঃ) আহত হয়ে পড়েছিলেন, তখন গর্বভরে তুমি ঘোষণা দিচ্ছিলে اعلى هبل হুবলের মর্যাদা উন্নত হোক। আজ দেখ, সেই হুবল কোথায়? আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, 'সেই কথা যেতে দাও। আজ স্পষ্টই দেখতে পারছি, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকলে এরূপ হতো না। হযরত রসূল করীম (সাঃ) কা'বা ঘরে অঙ্কিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের ছবি মুছে ফেলার জন্য হযরত উমর (রাঃ)-কে আদেশ দেবার পর কা'বা গৃহের ভিতরে দুই রাকাত নফল নামায পড়লেন এবং বাইরে এসেও দুই রাকাত নফল নামায পড়লেন। হযরত উমর (রাঃ) সকলের ছবি মিটালেন বটে। কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর ছবিটি মেটালেন না। তিনি ভাবলেন, মুসলিম হিসাবে, আমরাও তো তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করি। এই ছবিটি রক্ষিত দেখে হুযুর (সাঃ) বললেন,

ما كان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين -
(ال عمران : ٦٧)

অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) না তো ইহুদী ছিলেন, না খৃষ্টান ছিলেন, বরং তিনি আনুগত্য কারী মুসলমান ছিলেন। তিনি মুশরেক ছিলেন না। এই কথা শুনার পর হযরত উমর (রাঃ) ছবিটি

মিটিয়ে দিলেন। ইহার পর হুযুর (সাঃ) যমযম কূপ হতে পানি আনলেন। কিছু পানি পান করলেন এবং বাকি পানি দিয়ে ওযু করলেন। ইহার পর হুযুর (সাঃ) মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা দেখে নিয়েছো, খোদার অঙ্গীকার কিভাবে পূর্ণ হয়েছে। এখন বল, তোমাদের অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতনের বিচার কি হবে? মক্কাবাসীরা বল্লো, আমরা আপনার কাছ থেকে ঐরূপ ব্যবহার চাই, যেই ব্যবহার হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। একথা শুনা মাত্র দয়ার সাগর, বিশ্বের মহোত্তম মহাপুরুষ হযরত রসূল করীম (সাঃ) ঘোষণা করে দিলেন—

لا تثريب عليكم اليوم انا الله

খোদার কসম! আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। মৃত্যুর মুখোমুখী মক্কাবাসীর কানে এ ঘোষণা মন্ত্রের মত কাজ করল— অন্ধকার মক্কার আকাশে সূর্য তার সকল উজ্জলতা ও আলো নিয়ে উপস্থিত হল। মৃত্যু তাদের দুয়ারে এসে আশ্চর্যভাবে থেমে গেল। তাদের মনে আনন্দ আর ধরে না। তাদের মনের গহিন হতে মক্কার আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর'। মক্কা বিজয় সম্পন্ন হলো।

এ বিজয় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাবীর সত্যতার এক উজ্জল দৃষ্টান্তে পরিণত হলো। শুধু তাই নয়, সত্যের কাছে মিথ্যা যে কিভাবে পরাভূত ও পরাজিত হয়, মক্কা-বিজয় তার একটা চিরস্মরণীয় উদাহরণ। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এই বিজয়ের সাথে কুরআন শরীফের বহু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। মক্কা বিজয়ের ভিতর দিয়ে হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী যা গীতা ও 'তওরাতে' বিধৃত রয়েছে তাও পূর্ণতা লাভ করেছে। তৌরাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, দশ হাজার পবিত্র আত্মার বাহিনী সহ সে (মহামানব) ফারাণ পর্বত হতে আগমন করবে।

সুতরাং মক্কা বিজয় একদিক থেকে রহমাতুল্লীল আলামীন এর চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও মানব-প্রেম ও ক্ষমার যেমন এক অপূর্ব নিদর্শন তেমনিই এই বিজয় তাঁর সত্যতারও এক উজ্জল নিদর্শন।

আল্লাহুমা সাল্লে আলা নাবীইয়েকা দায়েমান ফি হাযেহিদ্দুনিয়া ওয়া বা'সিন সানী।

শুভেচ্ছা বাণী

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমারা আমাদের অগণিত পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আসুন এ দিনে আমরা আমাদের প্রিয় নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপরে অসংখ্য দরূদ প্রেরণ করি এবং নিজেদের মাঝে তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার বাস্তবায়নে ব্রতী হই।

আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদী ওঁয়া আলা আলে মুহাম্মাদীন ওয়া বারিকা ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

সম্পাদক

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দূরদর্শিতা

মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী
সদর মুরব্বী

হিজরী ৬ষ্ঠ সনের 'যুল কা'দা' মাস। হুযূর করীম (সাঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে কা'বা শরীফের তওয়াফ করছেন। এই স্বপ্ন দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রসূল (সাঃ)-কে জানালেন যে, তিনি (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) ভবিষ্যতে হজ্জ করার তৌফীক লাভ করবেন। কিন্তু হুযূর (সাঃ) মনে করলেন যে, সেই বছরেই তাঁরা হজ্জ করার সৌভাগ্য পাবেন। তাই তিনি তাঁর এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের জানালেন এবং তাঁদেরকে কা'বা শরীফ যিয়ারতের প্রস্তুতি নিতে বললেন। মদীনার নিকটবর্তী গোত্রদেরকেও তিনি এই কাফেলায় যোগ দেয়ার আহ্বান জানালেন। অতঃপর প্রায় ১৫০০ সাহাবার একটি কাফেলা হজ্জের নিয়্যতে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ হুযূরের সঙ্গে ছিলেন। সঙ্গে কুরবানীর পশুও নেয়া হল। আরবের পূর্ব প্রচলিত প্রথানুসারে বছরের এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। হুযূর (সাঃ) কাফেলার সামনে একটি অগ্রবর্তীদল প্রেরণ করেছিলেন। কাফেলা "যুল হুলায়ফা" পৌঁছলে হুযূরে পাক (সাঃ) সবাইকে "এহরাম" বাঁধার নির্দেশ দেন। তখন পর্যন্ত রসূলে করীম (সাঃ) মনে করেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ করতে চলেছেন। কিন্তু কাফেলা যখন মক্কার কাছাকাছি 'আসকান' নামক স্থানে পৌঁছায় তখন অগ্রবর্তী দলের লোকেরা এসে হুযূর (সাঃ)-কে জানায় যে, কুরায়েশরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে। এমনকি তারা মুসলমানদের বাধা দিতে খালেদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরামার নেতৃত্বে দু'শ জনের একটি সশস্ত্র দলও প্রেরণ করেছে। একথা জানার পর হুযূর (সাঃ) সাধারণভাবে ব্যবহৃত পথ ছেড়ে সমুদ্রের পার ঘেঁষা দুর্গম পথ অবলম্বন করেন। মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়ার উপত্যকায় যখন হুযূর (সাঃ) উপনীত হন তখন হুযূর (সাঃ)-এর উটনী যার নাম ছিল 'কাসওয়া' সেখানে হঠাৎ পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। সাহাবীগণ (রাঃ) মনে করেন 'কাসওয়া' ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। কিন্তু হুযূর (সাঃ) ঘোষণা দেন যে, 'কাসওয়া' ক্লান্ত হয়ে বসেনি বরং তাকে সে সত্তাই বাঁধা দিয়েছেন যে সত্তা 'আসহাবে ফিলকে' (আব্রাহার হস্তী বাহিনীকে) মক্কায় যেতে বাধা দিয়েছিলেন। হুযূর আরও বলেন যে, মক্কার হেরেমের সম্মান রক্ষার্থে লোকেরা আমার কাছে যা দাবী করবে আমি তা মেনে নিব। এ দুটি কথা থেকে বুঝা যায় যে, এই পর্যায়ে গিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় নবী বুঝতে পেরেছিলেন যে, হুদায়বিয়ায় নিয়ে আসার পেছনে আল্লাহ্‌তা'লার একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে। একথা বুঝার সাথে সাথে তিনি নিজের সমস্ত

ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে আল্লাহ্‌র মহাপরিকল্পনার সামনে বিসর্জন দিয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার পরবর্তী ঘটনাগুলি এ কথাই প্রমাণ করে।

এরপর একে একে কাফেরদের সর্দাররা হুযূর (সাঃ)-এর সাথে কথা বলতে আসে। প্রথমে আসে কাফেরদের সর্দার বাদিল বিন ওয়ারকা খুযাঈ। সে জানায় যে, মক্কার লোকেরা হুযূর (সাঃ)-কে এবার কোন মতেই তওয়াফ করতে দিবে না। হুযূর (সাঃ) বলেন যে, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। প্রয়োজন হলে আমি শান্তির জন্য সন্ধি করতে রাজী আছি। হুযূর (সাঃ) কিছু শর্তাবলীও উল্লেখ করেন। বাদিল বিন ওয়ারকা কাফেরদের সাথে পরামর্শ করার নিমিত্তে মক্কায় ফিরে গেল। মতামত শুনার পর মক্কাবাসীরা "সাকীক" গোত্রের সর্দার উরওয়া বিন মাসউদকে প্রতিনিধি করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে মুসলমানদের ঐক্য ও ভালবাসার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। তাঁদের ঐক্য, রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য ভালবাসা ও আন্তরিক টান ও ধর্মসেবার অদম্য স্পৃহা দেখে সে ফিরে আসে আর রিপোর্ট দেয় যে, "আমি অনেক রাজা বাদশাহ্‌ দেখেছি। রোমের সিজার, পারস্যের কিসরা আর হাবশার নাজ্জাসির শাহী দরবারে প্রতিনিধিরূপে গিয়েছি। কিন্তু কোন প্রজাকে তাদের রাজাকে এমন ভক্তি করতে ও ভালবাসতে দেখিনি যেমনটি মুহাম্মদের অনুসারীরা তাকে ভক্তি করে। আমার পরামর্শ হচ্ছে যে, মুহাম্মদ যা চাচ্ছে তা তাকে দিয়ে দাও, সে ন্যায়-সঙ্গত দাবী করেছে।" একজন পরম শত্রুর মুখে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই মহাসফলতার স্বীকৃতি সত্যিই একটি বিরাট সার্টিফিকেট। হুযূর (সাঃ) একটি বন্য জাতিকে তওহীদের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে নিজের যে, মাকাম ও মর্যাদা নিজ অনুসারীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ভ্রাতৃত্বের যে, দৃঢ়-অটুট বন্ধন তিনি রচনা করেছিলেন — ধর্মের ইতিহাসে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি নেই।

মক্কাবাসীরা উরওয়া বিন মাসউদের মতামত শুনে 'হুলেইস বিন আলকামাকে' আলোচনা করার জন্য প্রেরণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে কুরবানীর পশু বিশেষভাবে দেখাবার ব্যবস্থা করেন। সে যখন কুরবানীর উদ্দেশ্যে আনিত পশুর পাল দেখে আর মুসলমানদের উচ্চঃস্বরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে শুনে তখন সে বিমোহিতভাবে কুরায়েশদের কাছে ফিরে যায় আর বলে, "এরা তো (অর্থাৎ মুসলমানগণ) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে এসেছে, সাথে কুরবানীর পশুও এনেছে। এদেরকে কা'বার তওয়াফ থেকে বাধা দেয়া উচিত হবে না।"

বার বার আলোচনায় বসার এই ঘটনা থেকে একদিকে যেমন হুযূর (সাঃ)-এর পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রতীয়মান হয় তেমনি অন্যদিকে আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের সুন্নতও সাব্যস্ত হয়। আজকের পৃথিবীতে যারা অন্যায় রক্তক্ষরণ এড়ানোর জন্য বার বার আলোচনার টেবিলে বসেন বা বসার কথা বলেন তারা স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সুন্নতকেই অনুসরণ করেছেন।

যাইহোক, স্বাভাবিকভাবেই হুলাইস বিন আলকামার মতামত ও পরামর্শ মক্কার কাফেরদের মনঃপুত হয় নি। তাই তারা শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে সোহেল বিন আমরকে প্রেরণ করে। এরই মাঝে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর একজন সাহাবীকে মক্কাবাসীদের কাছে মদীনা থেকে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য তুলে ধরার জন্য প্রেরণ করেন। ইকরামা (আবু জাহলের পুত্র) সেই সাহাবীর উটের উপর হামলা করে এবং সাহাবীকে মারতে উদ্যত হয়। মক্কার বয়ঃজ্যেষ্ঠরা ইকরামাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করেন। উক্ত সাহাবী হুদায়বিয়া ফিরলে হুযুর করীম (সাঃ) এবার হযরত উসমান (রাঃ)-কে নিজের দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। হযরত উসমান মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর অনেক আত্মীয় তখনও মক্কায় ছিলেন। মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ানও হযরত উসমান (রাঃ)-এর আত্মীয় ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে তাদের উপকারও করেছিলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত উসমানকে মক্কার মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধিকল্পে তাদের সাথে দেখাও করতে বলেন।

হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় গিয়ে আবু সুফিয়ানের সাথে কথা বলেন। পরে কাফেরদের এক সভায় প্রকাশ্যভাবে হুযুর (সাঃ)-এর প্রস্তাব পড়ে শুনান। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদের জিদ ছাড়তে নারাজ। হযরত উসমান (রাঃ) তাদেরকে রাজী করার জন্য চাপ দিতে থাকলে তারা কেবল হযরত উসমান (রাঃ)-কে তওয়াফ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ যতক্ষণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তওয়াফ না করছেন ততক্ষণ আমিও তওয়াফ করতে পারি না। কি অদ্ভুত সফল শিক্ষক ছিলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) আর কি অদ্ভুত কৃতী ছাত্র ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। দূত হিসেবে করণীয় কর্তব্য পালন করে জগতকে শিখিয়েছেন যে, কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়।

এরপর হযরত উসমান হুদায়বিয়ায় ফিরে যেতে চাইলে তাঁকে মক্কার লোকেরা বাধা প্রদান করে। অন্য দিকে হুদায়বিয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উসমান (রাঃ) কাফেরদের হাতে শহীদ হয়েছেন। এই কথা ছড়ানো মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমস্ত সাহাবাদের একত্রিত করেন। তারপর হুদায়বিয়ার প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয় 'বয়আতে রিযওয়ান''। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত যে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরণের অপমান সহ্য করছিলেন, উরওয়া বিন মাসউদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা ও আচরণ যারা চোখ বুজে সহ্য করছিলেন, হঠাৎ সেই কোমল প্রাণ মুসলমানরা হুযুর করীম (সাঃ)-এর আহ্বানে দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলে হুযুরের হাতে হাত রেখে বয়আত করেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন: ''যদি উসমান (রাঃ) সত্যি সত্যিই কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে থাকেন তবে আজ আমরা তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবই নিব। আমরা সবাই মরে যাব কিন্তু তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো না।'' আল্লাহ্‌তা'লা তাদের এই অঙ্গীকারকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বয়াতকারীদের

উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। জীবনের বাজী রেখে এই বয়আত নেয়া হয় বলে এই অনুষ্ঠানকে 'বয়আতে মওউত'ও বলা হয়। বয়আতের সময় হুযূর (সাঃ) নিজের এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে ঘোষণা দেন: "এই হাত উসমানের পক্ষ থেকে বয়আতে অংশ নিচ্ছে।"

বাহ্যতঃ নিরস্ত্র ও নিঃসহায় একটি জাতির হঠাৎ এই দৃঢ়চিত্ততা সত্যিই এক অবাক কাণ্ড! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বড় করে দেখেছিলেন। যে পর্যায়ে তাঁকে নম্রতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল সেখানে তিনি তাই করেছিলেন। কিন্তু যখন দূতের অবমাননার প্রশ্ন উঠল তখন অত্যন্ত শক্তভাবে তিনি দূতের মর্যাদা রক্ষার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই বয়আতের ঘটনা সমগ্র বিশ্ববাসীকে কিয়ামত পর্যন্ত এই শিক্ষা দিচ্ছে: "দূতের সত্তা স্বয়ং প্রেরকের সমান। দূতের উপর আক্রমণ করার অর্থ গোটা জাতির উপর আক্রমণ করা।" আমাদের নবী (সাঃ) পৃথিবীতে দূতের মর্যাদা প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আরও একটি দিক বুঝতে হবে। সেটি হচ্ছে হুযূর করীম (সাঃ) জানতে পেরেছিলেন যে, হযরত উসমান শহীদ হন নি বরং জীবিত আছেন। কেননা হুযূর (সাঃ) নিজের এক হাতকে উসমান (রাঃ)-এর প্রতিনিধিত্বে 'বয়আতে রিযওয়ানে' শামিল করেছিলেন। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, মৃত ব্যক্তির জন্য বয়আতের কোন আবশ্যকতা নেই। তাই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে জীবিত জেনেই তাঁকে বয়আতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সুতরাং 'বয়আতে রিযওয়ানের' প্রকৃত উদ্দেশ্য হযরত উসমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছিল না বরং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রেরিত দূতের মর্যাদা চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা।

এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার খবর মক্কায় পৌঁছলে কুরায়েশরা বিচলিত হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তারা উসমান (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে দেন এবং সোহেল বিন আমরের কাছে সংবাদ দিয়ে লোক পাঠায় যে, যেভাবে সম্ভব মুসলমানদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, তবে শর্ত একটাই তারা যেন এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করে।

সোহেল বিন আমর আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চুক্তি লিখতে বসলেন। হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাঃ) চুক্তির লেখক রূপে নিযুক্ত হলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।' সোহেল আপত্তি করে বলল, 'রাহমান রহীম আবার কি?' কেবল 'বিসমিল্লাহ'ই যথেষ্ট। হুযূর (সাঃ) তার কথা মেনে নিলেন। আবার হুযূর (সাঃ) হযরত আলীকে লিখতে বললেন, এই চুক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত। সোহেল বলল, 'আমরা' আপনাকে আল্লাহ্‌র রসূল মানি না। আপনাকে তা মানলে তো আর কোন চুক্তির প্রশ্নই ছিল না।' ততক্ষণে হযরত আলী 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি লিখে ফেলেছেন। হুযূর (সাঃ) তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি কেটে দাও। হযরত আলী (রাঃ) বললেন 'এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়'। তখন হুযূর (সাঃ) নিজ হাতে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দেন। হুযূর (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে গেলেন বিধর্মীদের সাথে সন্ধিকালে সাধারণ বিষয়াদির উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ এমন

বিষয়াদির উল্লেখ থাকবে যে বিষয়ে উভয় পক্ষই একমত। যাইহোক হুদায়বিয়ার প্রান্তরে নিম্নে বর্ণিত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(১) মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা তওয়াফ বা হজ্জ না করেই এ বছর ফেরৎ চলে যাবেন।

(২) আগামী বছর তারা মক্কায় এসে উমরাহ পালন করতে পারেন। তবে খাপে ভরা তরবারী ছাড়া অন্য কোন সমরাস্ত্র তারা বহন করতে পারবেন না। তিন দিনের বেশী তারা মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি মক্কা ছেড়ে মদীনায় যেতে চায় সে মুসলমান হলেও মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে মদীনায় আশ্রয় দিবেন না বরং মক্কায় ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মদীনা ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলে যায় তবে তাকে মুসলমানরা বাধা দিবে না আর মক্কাবাসীরাও তাকে মদীনায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকিবে না।

(৪) আরব গোত্রদের মাঝ থেকে যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ (হালীম) হতে চায় তারা চুক্তি করতে পারে আর একই ভাবে যারা মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি করতে চায় তারা স্বাধীন ভাবে করতে পারে।

(৫) এই চুক্তি দশ বছরের জন্য সম্পাদিত হ'ল। উক্ত সময়ে কুরায়েশ ও মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

চুক্তির এই শর্তাবলী মুসলমানদের অত্যন্ত অসহ্য ও লাঞ্ছনাদায়ক মনে হল। বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয় চুক্তি বাহ্যতঃ মুসলমানদের অপমান ও লাঞ্ছনা ঘোষণা করছিল। ক্ষোভে দুঃখে তাঁরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তখনও গম্ভীর ও অবিচল। এরই মধ্যে আরেকটি বড় পরীক্ষা এসে দাঁড়ায়। কাফেরদের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী সোহেল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দাল রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় হাতে পায়ে ভাঙ্গা শিকলের অংশ নিয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় চলে আসে। সে মুসলমানদের কাছে নিজের করুণ অবস্থা বর্ণনা করে বলে যে, মুসলমান হওয়ার পর থেকে তার পিতা সোহেল তাকে বন্দী করে রাখে আর তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। সে মুসলমানদেরকে তার উপর চালানো অত্যাচারের চিহ্নাবলী দেখায় আর তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমার এই করুণ ও অবর্ণনীয় অবস্থা দেখেও কি তোমরা আমাকে সেই জাহান্নামে ফেরৎ পাঠাবে?' মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অত্যাচারিত মুসলিম ভাইএর সাহায্যার্থে তরবারীর হাতলে তাদের হাত পৌঁছে যায়। তখন পর্যন্ত চুক্তির শর্তাবলীর উপর স্বাক্ষর করা হয়নি। এমতাবস্থায় হুযুর (সাঃ) কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করে বলেন, "আবু জান্দাল ধৈর্য ধারণ কর আর সব কষ্টকে পুণ্য জেনে সহ্য কর। নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রতিপালক তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গী মুসলমানদের জন্য অবস্থার উন্নতি ঘটাবেন। আমরা যেহেতু ঐ চুক্তি করে ফেলেছি, চুক্তিভঙ্গ করা কোনমতেই আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।'

কথা দিয়ে কথা কিভাবে রাখতে হয় উক্ত ঘটনায় হুযূর পাক (সাঃ) আমাদেরকে তা শিখিয়ে গেছেন। একদিকে সাহাবীগণ উত্তেজিত, চুক্তির শর্তাবলী তাদের মনঃপুত হয় নি। অন্যদিকে নিপীড়িত রক্তাক্ত মুসলমান ভাইএর উপস্থিতি। তার উপর চুক্তি তখনও স্বাক্ষরিত না হওয়ার বাহানা বর্তমান ; যেহেতু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না তাই তিনি জনগণের সমর্থন বা বিরোধিতা নিয়ে চিন্তা করেন নি। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করলেন। কেবল তাঁরই ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিলেন। দুনিয়ার কোন নেতার এত বড় বুকের পাটা নেই যার সাথে এই ঘটনার তুলনা করা চলে। এ গৌরব কেবল হযরত নবী করীম রসূলুল্লাহ খাতামান্নবীঈন (সাঃ) এর প্রাপ্য ছিল।

এ পর্যায়ে হযরত উমরের মত বড় সাহাবীও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি হুযূর (সাঃ)-কে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন : "আপনি কি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল নন? আমরা কি সত্য পথে নই?" হুযূর (সাঃ) তাঁকে উত্তর দিলেন, "অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি চলতে পারি না। তিনিই আমার রক্ষক ও সাহায্যকারী।" হযরত উমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন : আপনি কি আল্লাহ্‌র ওহী অনুসারে আমাদেরকে বলেন নি যে, নিশ্চয়ই আমরা মক্কায় প্রবেশ করব এবং কা'বার তওয়াফ করব? হুযূর (সাঃ) উত্তরে বল্লেন : "বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওহীতে আল্লাহ্‌ একথা তো বলেন নি যে, এ বছরই সেটি হবে।" হযরত উমর তখনও অস্থির। তিনি ছুটে গেলেন হুযূর (সাঃ)-এর নিকটতম সাহাবী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে। হযরত আবুবকর তাঁকে উত্তরে কেবল এটুকুই বললেন, "উমর! রসূলুল্লাহ্‌র হাতে একবার যে হাত সমর্পণ করেছো সে বাঁধন যেন আবেগের স্রোতে ঢিলা না হয়।" হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মুসলমানদের কি বিরাট পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর আচরণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সন্ধি সম্পাদনের পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদেরকে স্ব-স্ব কুরবানীর পশু যবাই করতে বলেন। হজ্জ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানেই কুরবানী দেয়া কুরআনের বিধান। সেমতে হুযূর (সাঃ) এই কাজের নির্দেশ দেন। কিন্তু সাহাবীগণ নীরব, নিথর! তাদের মধ্যে কুরবানী দেয়ার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। হুযূর (সাঃ) বিমর্ষচিত্তে তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। হুযূর (সাঃ)-এর মানসিক অবস্থা দেখে এগিয়ে আসলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার জাতি অবাধ্য নয় এবং তাঁরা বিদ্রোহও করে নি। তাঁরা শোকে বিহ্বল আর দুঃখে মুহ্যমান। এবারও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আপনাকেই হাল ধরতে হবে। আপনি প্রথমে নিজের পশুটি কুরবানী করুন, আপনার জাতি আপনাকে অনুসরণ করবে।" হুযূর (সাঃ) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) যা বলেছিলেন ঠিক তাই হল। হুযূর (সাঃ)-কে কুরবানী করতে দেখে মুসলমানরা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তাঁরাও

সবাই একাধারে নিজ নিজ জানোয়ার আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করলেন। এভাবে উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) এই উম্মতের উপর একটি বড় অনুগ্রহ করলেন। তাঁরই কারণে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের মাঝে একটি সাম্ভাব্য ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটল। হুযুর (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের পরামর্শকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন এ ঘটনা তাই তুলে ধরছে।

মদীনায় ফেরার পথে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে ইলহাম করলেন: "নিশ্চয়ই তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। অদ্ভুত ব্যাপার! বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার করে ফিরছেন তিনি। কিন্তু আল্লাহ্‌ হুদায়বিয়ার ঘটনাকে পরাজয় বল্লেন না, সন্ধিও বল্লেন না, অপমান বলেও আখ্যা দিলেন না, বরং বল্লেন: এটি তোমার সুস্পষ্ট বিজয়! তবে এটি কোন বিজয়? তাহলে শুনুন, এটি হচ্ছে নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিজয়। হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তোমার নিজ সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে খোদার সামনে বলি দিতে পেরেছ। তোমার গৃহীত পরিকল্পনাকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার সামনে নিমিষে বিসর্জন দিয়েছো। মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার উপর খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছো। বাহ্যতঃ অপমান মাথা পেতে নিয়েছো তবুও আল্লাহ্‌র আজ্ঞা পালনে বিলম্ব কর নি। এ বিজয় তোমার! এটি তোমার প্রকাশ্য বিজয়! এত স্বার্থক বান্দা জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমরা তোমার এই সব কার্যকলাপ গ্রহণ করলাম। হে মুহাম্মদ (সাঃ)! লোকদের হজ্জ কবুল হলে আমরা তাদের পূর্বকৃত সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিই। কিন্তু আমরা তোমার সে হজ্জও কবুল করলাম যে হজ্জ তুমি করতে পার নি। এত বেশী কবুল করেছি যে, তোমার পূর্বের মানবিক দুর্বলতাও আমরা ঢেকে দিয়েছি এবং পরবর্তীতেও যদি কোন মানবিক দুর্বলতা আরোপিত হয় তাও ঢেকে দিয়েছি। এর চেয়ে বড় হজ্জ আর কি আছে?

এই হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)। হুদায়বিয়ার প্রান্তরে কিংবা উহুদের রণক্ষেত্রে কিংবা মসজিদের মেহরাবে—সব জায়গায় তিনি আমাদের রহমত বিতরণ করে গেছেন। আমরা কেবল তার আদর্শ নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করব। "হে আল্লাহ্‌! তোমার অগণিত ও সীমাহীন রহমত ও বরকত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং তাঁর বংশধরদের উপর নাযিল কর যেরূপে তুমি রহমত ও বরকত দান করেছিলে ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংশিত, মহামর্যাদাবান।"

পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

রাখে আল্লা মারে কে ?

স্নেহের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা !

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি তোমরা সকলে কুশলেই আছো। অনেক দিন পর আবার তোমাদের উদ্দেশ্যে লিখতে বসেছি। তোমরা জান আল্লাহ্‌তা'লা সর্বশক্তিমান। তিনি যখন যা ইচ্ছে করেন, তা-ই করতে পারেন। তিনি যাকে রক্ষা করেন তাকে কেউ মারতে পারে না। মাকড়শার জাল দিয়ে তিনি পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিতে সক্ষম। তিনি যদি চান তাহলে বালকের শরাঘাতে শক্তিধর বীর সেনানীকেও ভূতলশায়ী করাতে পারেন। অতি নগণ্য ও তুচ্ছ জিনিষ দিয়ে তিনি বিরাট বিরাট কার্য সম্পাদন করে থাকেন। একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর জীবন এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করার নামই খোদায়ী শক্তি। যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাই বলেছেন—যব কাহে কে ম্যায় করুঙ্গা ইয়েহ্ জরুর, টালতি নেহী ওহ্ বাত খোদায়ী এহিতো হ্যায় অর্থাৎ তিনি যখন বলেন, আমি নিশ্চয়ই ইহা করব, তখন এর কোন পরিবর্তন হয় না। ইহাই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ। জীবনের প্রথম থেকে খোদার এহেন শক্তির প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে সাধারণ সাধারণ লোক হয়েও আমরা দুনিয়াতে ব্যতিক্রমধর্মী অনেক কিছু করতে সক্ষম হবো, এতে সন্দেহ নেই। রসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে আমরা এ সর্বশক্তিধর খোদার লীলা বহু বার দেখতে পাই। একটা ঘটনা বর্ণনা করছি যাথেকে তোমরা বুঝতে পারবে আল্লাহ্‌র শক্তির মহিমা কত বিরাট !

আমাদের প্রিয় নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াতের দাবীর পর প্রিয় মাতৃ ভূমিতে দীর্ঘ তের বছর যাবৎ নির্মমভাবে নির্যাতিত নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। সত্যের প্রচারকল্পে তিনি তায়েফ পর্যন্ত সফর করেছিলেন। কিন্তু সত্যের বিরোধীরা মারপিট করে সেখান থেকেও তাঁকে রক্তাক্ত কলেবরে বের করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ইয়াসরীব অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার আমন্ত্রণ পান। কিন্তু মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মক্কায় থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। তাঁর কতিপয় সাহাবা (রাঃ)-কে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

৬২৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি হুযুর (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ পেলেন আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে। ঐ দিনই দুপুর বেলা রৌদ্রতপ্ত বালুকা রাশির উপর দিয়ে প্রিয় নবীজী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ী গেলেন তাঁকে এ খবর দেয়ার জন্যে। হযরত আবুবকরের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি এমনই এক শুভক্ষণের জন্যে অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। এমনকি তিনি যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে ৪ মাস ধরে বাবলা গাছের সাথে ২টি এক কুঁজওয়ালা উট বেঁধে রেখেছিলেন। পথে দেয়ার জন্যে হযরত আবুবকর ইবনে আবু কুহাফা (রাঃ)-এর বড় মেয়ে আসমাকে খাবার প্রস্তুত করতে বলা হলো। সিদ্ধান্ত হলো, ঐ রাতেই তাঁরা মক্কা ত্যাগ করে মক্কা থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে সওর নামক গুহায় আশ্রয় নিবেন।

তিনি বাড়ী পৌঁছে হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর বাড়ীতে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, এজন্যে যে, হুযুর (সাঃ)-এর নিকট বহুলোকের যে মালামাল গচ্ছিত রাখা ছিল তা যেন সঠিকভাবে ফেরৎ দেয়া যায়।

সন্ধ্যা রাতের দিকে কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রের যুবকগণ হুযুর (সাঃ)-এর গৃহের চারিদিকে গোপনে সমবেত হলো এবং তাঁর গৃহের চারিদিক অবরোধ করে রাখলো ভোর বেলা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনায়। কিন্তু হুযুর (সাঃ) শেষ রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে আর নিরাপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কুরায়েশ যুবকগণ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ ছেড়ে দিল এই ভেবে যে, তিনি অন্য কোন লোক। তাদের চিনে ফেলতে পারেন। তাই তারা নিজেরাই চিহ্নিত হবার ভয়ে আড়ালে সরে গেল। এ ভাবে অনায়াশেই হুযুর (সাঃ) মৃত্যু গুহা থেকে বেঁচে গেলেন। প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়ার সময়ে তিনি মক্কার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'হে মক্কা! সমগ্র জগৎ অপেক্ষা তুমি আমার নিকট প্রিয়। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে এখানে থাকতে দিল না।' মাতৃভূমি ত্যাগ করার কি যাতনা তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না।

যাহোক সূর্যোদয়ের বহু পুর্বেই তারা গুহায় পৌঁছলেন। প্রথমে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে গুহাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)। হুযুর (সাঃ) পরে গুহায় প্রবেশ করলেন আত্মগোপনের জন্যে। গৃহ পরিত্যাগ করার পুর্বে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে কুরায়েশদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে এবং প্রতিদিন সওর গুহায় খবর পৌঁছাতে বলে যান। হযরত আবুবকর (রা)-এর খাদেম আমের বিন ফোহায়রার ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সে যেন সারাদিন বকরী চড়ায় এবং রাতে গুহায় দুধ পৌঁছে দেয়। এভাবে তাঁ-হযরত (সাঃ) তিন দিন তিন রাত সওর গুহায় কাটান। এরপর নবুওয়াতের চতুর্দশ সনের ৪ঠা রবিউল আউয়াল মতান্তরে ১লা রবিউল আউয়াল তাঁরা মদীনার পথে রওয়ানা হন।

পরদিন সকালে কুরায়েশ যুবকগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে গৃহে দেখতে না পেয়ে আর হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর বিছানায় পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। প্রথমে তারা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসাবাদ এবং মারপিট করল এবং পরে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহে গিয়ে আসমাকে ভয় ভীতি দেখিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর সন্ধান বের করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন ফল হলো না। তারা বুঝতে পারল যে, হাজার পাহাড়া ভেদ করে পাখী পালিয়ে গেছে। তারা ঘোষণা দিল যে, মুহাম্মদের (সাঃ) মাথা যে এনে দিতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের লোভে লোক জন আমাদের প্রিয় নবী-জীকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। পরে তারা পদক্ষেপ পারদর্শীদের নিযুক্ত করল। পারদর্শীরা পায়ের ছাপ দেখে দেখে সওর গুহার মুখে এসে পৌঁছলো। তারা নিশ্চিত ভাবে একথা বলছিল যে, হয় মুহাম্মদ (সাঃ) এই গুহায় রয়েছে নচেৎ আসমানে চলে গেছে। দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

গুহার ভিতরে বসে হযরত আবুবকর (রাঃ) বাইরের লোকদের কথা বার্তা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বল্লেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! লোকরাতো গুহার মুখের নিকট এসে গেছে। আমি তাদের কথা বার্তা শুনছি। তারা যদি গুহার অভ্যন্তরে তাকায়, তাহলেই তো আমাদের দেখে ফেলবে। আমরা তো মাত্র দু'জন, ওরা অনেক। ধৈর্য ও স্থৈর্যের মহামূর্তিমান পুরুষ হুযুর (সাঃ) নির্ভয়ে অনাবিল চিত্তে বল্লেন, 'লা তাহ্‌যান ইন্নাল্লাহা মায়ানা' —হে আবুবকর, ভয় পেয়োনা, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা দু'জন নই, আমরা তিনজন। আমাদের সাথী তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ্!

কুরায়েশগণ হুযুর (সাঃ)-এর গুহায় অবস্থান সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু, তাদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য বৃদ্ধ বলে উঠল, 'তোমরা দেখছি পাগল হয়ে গেছ। যে গুহার মুখে মাকড়শার অবিকৃত জাল দেখছ, আর যেখান থেকে এই মাত্র কবুতর উড়ে গেলো, সেখানে মানুষ গেলো কিভাবে? একথা শুনার পর বিশেজ্ঞরা পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলো না। তারা হতোদ্যম হয়ে মক্কার দিক ফিরে চললো। তাই বলি, সেদিন মাকড়শার জাল দিয়েই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রিয় নবীজীকে রক্ষা করছিলেন। সেদিন যদি আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রিয় নবীকে রক্ষা না করতেন, তাহলে ইতিহাস হয়ত অন্য আর এক খাতে প্রবাহিত হতো। হুযুর (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা আরও কয়েকবার মানুষের হাত থেকে এমনি করে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়েছিলেন। কেননা তাঁর সাথে আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা ছিল—'ইন্নি ইয়াসেমুকা মিনান্‌নাস'—নিশ্চয় আমি মানুষের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবো। অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে প্রবাদ বাক্য রচিত হয়, যা স্থায়ী সত্যকে ধরে রাখে। তেমনি একটা চির সত্য নিহিত আছে এই প্রবাদ বাক্যে—'রাখে আল্লা মারে কে?' আল্লাহ্ এমনি সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি সামান্য মাকড়শার জাল দিয়ে তাঁর প্রিয়তম মহামানব হুযুর (সাঃ)-কে শক্তিধর শত্রুদের আসন্ন প্রাণ-ঘাতী আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন। যে আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাঁকে এমনিভাবে বাঁচিয়ে নেন এবং তাকে সকল বিপদাপদে রক্ষা করেন। অতএব, হে প্রিয় ভাই-বোনেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় হবার জন্য চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় হবার উপায়সমূহ অবলম্বন কর।

সংবাদ

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

আগামী ৩১শে অক্টোবর, '৯১ তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বছর শেষ হতে যাচ্ছে। স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন ২০-১০-৯১ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব জামাতের ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করে ওয়াদার পরিমাণ ও চাঁদা আদায়ের পরিমাণ এ দুই ছকে প্রত্যেক চাঁদা আদায়কারীর অবস্থা বর্ণনা করে এখানে একটি রিপোর্ট পাঠান, যাতে ঐ রিপোর্টের প্রেক্ষিতে চাঁদা আদায়কারীদের জন্য হুযূর আকদাস (আইঃ)-কে দোয়ার অনুরোধ করা যায়। মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক কর্মকর্তার সঠিক দায়িত্ব পালনের ওপর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

মীর মোহাম্মদ আলী
সেক্রেটারী, তাহরীকে জাদীদ

আনসারুল্লাহর সংবাদ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বাৎসরিক তালীমুল কুরআন ক্লাস পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ১১ হইতে ১৬ই অক্টোবর '৯১ইং এর পরিবর্তে অনিবার্য কারণ বশতঃ ১লা নভেম্বর হইতে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হইল এবং ইজতেমার তারিখ ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর এর পরিবর্তে ৭ ও ৮ই নভেম্বর ধার্য করা হইল। সুতরাং পরিবর্তিত তারিখ স্মরণ রাখিয়া সংশ্লিষ্ট সকলে তদনুযায়ী তালীমুল কুরআন ক্লাস ও ইজতেমায় যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন।

ইতিপূর্বে জানানো হইয়াছিল যে, ''আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য'' পুস্তিকাখানি যেন জুমুআর নামাযের পর সাধারণ মিটিং করিয়া আনসার ভাইদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো হয়। উক্ত বিষয়ে কোন পদক্ষেপ করা হইয়াছে কিনা স্থানীয় মজলিসগুলিকে তাহা জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ
কায়েদ উমুমী
বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ

খোদ্দামের সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ ও নাযেম মাল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যাইতেছে যে, মজলিসের অর্থ বৎসর আগামী কিছু দিনের মধ্যে শেষ হইতে যাইতেছে। সুতরাং আপনারা বিশেষ প্রচেষ্টা চালাইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন্দ্রে চাঁদা প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। তাহাছাড়া আগামী ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর '৯১ অনুষ্ঠিতব্য

কেন্দ্রীয় ইজতেমায় আসার সময় ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট প্রণয়ন করিয়া সঙ্গে নিয়া আসিবেন যাহাতে পুরো বৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখাইবেন।

শহীদুল ইসলাম (বাবুল)
মোহতামীম মাল, মঃ খোঃ আঃ

২০তম বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর, ১৯৯১ইং মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশের ২০তম বার্ষিক ইজতেমা ও ৮ম ন্যাশনাল মজলিসে শূরা '৯১ দারুত তবলীগ ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌। ইজতেমার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

[বিঃ দ্রঃ—রচনা প্রতিযোগিতা : খোদ্দাম—"রাশিয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ও তার পূর্ণতা" (১০০০ শব্দ) আতফাল—"মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য" (৫০০ শব্দ)

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
মোতামাদ (ভারপ্রাপ্ত) বাঃ মঃ খোঃ আঃ

এতদ্বারা মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশের সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেব ও নাযেম তাজনীদ সাহেবের সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, চলতি সেপ্টেম্বর '৯১ সালের মধ্যে নূতন বর্ষের (৯১-৯২) তাজনীদ রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাইবেন। সঠিক তাজনীদ রিপোর্ট তৈরী করিতে যদি বিলম্ব হয় তাহা হইলে অবশ্যই আসন্ন কেন্দ্রীয় ইজতেমার পূর্বে অথবা ইজতেমায় আসার সময় তাজনীদ রিপোর্ট সঙ্গে নিয়া আসিবেন এবং খাকসারের নিকট জমা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি।

আফজাল হোসেন ভুইয়া
মোতামীম তাজনীদ, মঃ খোঃ আঃ

৩য় বার্ষিক আতফাল সম্মেলন

আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে প্রতিবারের মতো এবারও মজলিস আফফালুল আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বার্ষিক আতফাল সম্মেলন ২০শে অক্টোবর '৯১ রোজ রবিবার, ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে শান-শওকতের সাথে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সকল স্থানীয়, জেলা ও বিভাগীয় মজলিসের নাযেম আতফাল সাহেবকে স্বস্ব কার্যাবলীর বার্ষিক রিপোর্ট ১০ই অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব অনুষ্ঠানে এ বছরের শ্রেষ্ঠ তিনটি মজলিসকে পুরস্কার প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা ও আতফালুল আহ্‌মদীয়ার মহান লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ও দোয়া জারী রাখার বিশেষ অনুরোধ করছি।

মুহাম্মদ সেলিম খান
মোহতামীম আতফাল
মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ

কৃতী ছাত্রী

আমার ছেলে আমিনুল করীমের বড় মেয়ে মোসাম্মাৎ হামিদা খাতুন ১৯৯১ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের এস, এস সি, পরীক্ষায় ৩টি লেটার সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সে পদার্থ বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। সকলের নিকট তার দিন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে দোয়া প্রার্থী।

মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা
শান্তিনগর

শুভ বিবাহ

বিগত ৭-৭-৯১ মুনসীগঞ্জ জেলার রিকাবীবাজার জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এম, আব্দুর রউফ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাৎ নুসরত জাহান (পল্লী)-এর সহিত ঢাকা মীরপুর নিবাসী জনাব ডাঃ মির্যা আলী আখন্দ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব হানিফ আহমদ আখন্দ সাহেবের শুভ বিবাহ ৩০,০০১ (ত্রিশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে ঢাকার ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে বাদ জুমুআ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। উক্ত বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য, বর-কনের দীন ও দুনিয়াবী এবং রূহানী উন্নতির জন্য আহ্‌মদী ভাই-বোনদের খেদমতে দোয়ার আবেদন করিতেছি।

মাঈনউদ্দিন আহমদ
রেকাবী বাজার

সন্তান লাভ

আল্লাহ্‌তা'লা বিশেষ ফযলে গত ১৭ই আগষ্ট রোজ শনিবার ভোর ২-৩০ ঘটিকায় আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার দরখাস্ত এই যে, আল্লাহ্‌ যেন নবজাতককে দীর্ঘায়ু দান করেন এবং সিলসিলায় আলিয়া আহ্‌মদীয়ার একজন উচ্চ মোকামের খাদেম করেন।

মোঃ মেহেরুল ইসলাম
মীরপুর, ঢাকা।

শোক সংবাদ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জনাব মহিউদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন পুলিশ অফিসার) দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ৪ মাস কষ্ট ভোগ করে ২৫-৮-৯১ইং তারিখ বিকাল ৪ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, ৮ মেয়ে, নাতী-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী, রেখে গেছেন। মরহুম অত্যন্ত সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। জামা'তের প্রচণ্ড মোখালেফাতের সময় তাঁর বাড়ী লুটপাট হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও আহ্‌মদীয়াতে অটল।

মরহুমের রূহের মাগফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সাব্‌রে জামীলের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ মোশাররফ হোসেন
বি, বাড়িয়া

প্রাক্তন আমীর এস, এম, হাসান সাহেব আর নেই!

জামা'তের বন্ধুগণকে দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মুকাররম শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব অবসর প্রাপ্ত আই, সি, এস, (সিতারায়ে পাকিস্তান মেডেল প্রাপ্ত) ১৭-১৮ই আগষ্টের মধ্যবর্তী রাত্রে সাড়ে দশ ঘটিকায় ৮৩ বৎসর বয়সে লাহোর ক্যান্টনমেন্টে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন। তাঁর নামাযে জানাযা ১৮ই আগষ্ট তারিখে বাদ নামায যোহর মসজিদে মুবারক প্রাঙ্গণে মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব পড়ান। তিনি মুসী ছিলেন। বেহেশ্‌তি মকবেরাতে তাঁকে দাফন করা হয়। মরহুম জনাব সুবেদার লাল মুহাম্মদ সাহেবের সুসন্তান ও হযরত শেঠ আবদুল্লাহ আলাদীন অফ হায়দ্রাবাদের জামাতা ছিলেন। ১৯৩৩ সনে তিনি আই' সি, এস, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অর্জন করেন এবং মাদ্রাজ প্রদেশের নন্দয়ালে এসিসটেন্ট ক্যালেক্টর ও জয়েন্ট ম্যাজিসট্রেট পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিনের মধ্যে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন। পাকিস্তান হবার পর পশ্চিম পাকিস্তান ইণ্ডাসট্রিজ ও মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। তারপর মুলতান, শাহিওয়াল ও গুজরানওয়ালাতে ডিপুটি কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শেখুপুরাতে কিছু দিন সেশন জজ ছিলেন। ১৯৫১ সনে ঢাকাতে সেক্রেটারী ও চিটাগাং এ কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ১৯৭১ সন পর্যন্ত মেম্বর বোর্ড অফ রেভিনিউ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং লাহোর ক্যান্টনমেন্টে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি দশ বছর ঢাকার স্থানীয় ও প্রাদেশিক আমীর ছিলেন। ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশনের মেম্বার ছিলেন তিনি এবং অবসর গ্রহণের পর লাহোর জামা'তের কাযী পদে নিযুক্ত ছিলেন।আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন।

(সাপ্তাহিক আল ফযল থেকে অনূদিত)

তাঁর স্মরণে টেলিগ্রাম মারফত নিম্নোক্ত শোকবার্তা প্রেরণ করা হয় (বঙ্গানুবাদ)।

জনাব নাযের সাহেব
ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়া

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আমীর জনাব এস এম হাসান সাহেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। জামা'তের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ সেবার কথা আমরা স্মরণ করছি। তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুক। বাংলাদেশ জামা'তের পক্ষ থেকে আমি মরহুমের পরিবারের সকলকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। রাবওয়ার মোহতরম মিয়া নঈম আহমদ সাহেবের পরিবারের সদস্যদের নিকটও তাঁর জন্য দোয়া ও শোকবার্তা। অনুগ্রহ পূর্বক জ্ঞাত করে বাধিত করবেন।

স্বাক্ষর—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৫শে জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে জামা'তের মসজিদ প্রাঙ্গণে "ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি ও নৈতিকতা" শীর্ষক এক তবলীগি সেমিনার সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। বাদ আসর সভার কার্যক্রম শুরু হয় এবং মাগরিবের আযানের সাথে সাথে সমাপ্ত হয়। সভায় বেশ কিছু সংখ্যক খোদ্দাম, আতফাল ও আনসার এবং কিছু সংখ্যক জেরে তবলীগ ভাই উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রথম বক্তা জনাব মোসলেহ্‌ উদ্দিন। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল "পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি ও পরিবর্তনমুলক নৈতিকতা।"

অতঃপর "ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য" এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। সভার তৃতীয় বক্তা ছিলেন জনাব মোহাম্মদ বোখারুল ইসলাম বোখারী। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল "ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় এবং এর প্রতিকার"। সভার সর্বশেষ বক্তা ছিলেন উক্ত সভার সভাপতি এবং স্থানীয় আমীর মোহতরম নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল, "জাতীয় সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ভূমিকা।" অতঃপর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ বোখারুল ইসলাম বোখারী
মোতামাদ, চট্টগ্রাম মঃ খোঃ আঃ

গত ৫ ও ৬ই সেপ্টেম্বর '৯১ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১১তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌। একই সাথে বিভাগীয় কায়েদ সম্মেলনও হয়েছে। এ মহতি অনুষ্ঠানে সুন্দরবন, রঘুনাথপুর বাগ, নাসেরাবাদ ও রাজশাহী জামা তের সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সর্বজনাব আমীরুল হক, নূর মুহাম্মদ ও সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা রচনা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, গুলাইল, হা-ডুডু, ফুটবল ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা। মোট খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতি সংখ্যা ৬৩ জন।

আবদুর রশিদ
নায়েব কায়েদ খুলনা

(৭৩ পাতার পর)

করেছেন। তোমরা কি আক্‌ল বুদ্ধি খাঁটিয়ে কাজ করবে না। নবুওয়াতের পরে ঐ সব গুণাবলীর ওপর আল্লাহ্‌র উজ্জলতম নূর পতিত হয়ে, ঐগুলিকে আরো উজ্জল এবং আরো সম্প্রসারিত করে তুলে, যাতে করে নবীর কল্যাণবর্ষীতার গুণাবলী তাঁর ওফাতের পরেও বহুদিন স্থায়ী থাকে। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে ঐ সব গুণাবলীর উজ্জলতা ও কল্যাণবর্ষিতা এত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী যে, তা কেবল স্থায়ী হয়েই ক্ষান্ত হবে না বরং পৃথিবীর অধিবাসী শেষ মানবটি পর্যন্ত তাঁর কল্যাণবর্ষিতা হতে ফায়দা লাভ করবে।

তাই বলছিলাম, নবী-রসূলের কর্ম ময় জীবন আলোচনা করে তাথেকে পাথেয় সংগ্রহ করা এবং সেভাবে নিজেদের জীবনে রূপায়ন করাই আসল কাজ। শুধুমাত্র কল্প-কাহিনী সম্বলিত জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করে সীরাতুন্‌নবী দিবস পালন করে জেহাদের হুঙ্কার দিলে কোন লাভ আছে বলে আমরা মনে করি না। তাই মিলাদুন্‌নবী ও সীরাতুন্‌নবী নিয়ে বিতণ্ডার অবসান করে, আসুন আমরা নবীজির (সাঃ) জীবনের সহস্রমুখী পুণ্যময় কর্মধারার সাথে আত্ম-পরিচিতি ঘটাই এবং সেখান থেকে পথ চলার রসদ সংগ্রহ করি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন আগ থেকে শুনছি সীরাতুন্‌নবী। আর আজকাল শুনছি মিলাদুন্‌নবী ও সীরাতুন্‌নবী নিয়ে বিতণ্ডা। কেউ বলেন সীরাতুন্‌নবী উদযাপন করতে হবে, আর কেউ বলেন, সীরাতুন্‌নবী নয় মিলাদুন্‌নবী।

মিলাদুন্‌নবী মানে হুযুর (সাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনার জলসা বা অনুষ্ঠান। ছোট-বেলা অনেক মিলাদ শরীফের আসরে যোগদান করেছি। মাওলানা সাহেব আরবী-উর্দুতে সুর করে অনেক কিছু বলতেন এবং পরে দাঁড়িয়ে সবাই দরূদ পাঠ করতেন। মোনাজাত করে মিষ্টি খেয়ে মিলাদ শরীফের আসর শেষ হতো। কেউ কিছু বুঝত বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য পরবর্তীকালে দেখেছি বাংলায় সুর করে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শানে বলার জন্য বাংলা ভাষায়ও কিছু বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। যে বাড়ীতে মিলাদ পড়া হতো তাদের অগণিত সোয়াব হয়েছে বলে তারা মনে খুবই আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন আর যারা দাওয়াত পেয়ে আসতেন এবং যোগদান করতেন, তাদের নগদ লাভ মিঠাই মণ্ডা ছাড়া আর কিছু যে লাভ হতো না সে কথা ছোটবেলা থেকেই বেশ বুঝতে পারতাম।

ইদানিংকালে দেখতে পাই, ৯ই বা ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে "জসনে জুলুস" (আনন্দ মিছিল) বের করা হয়। আরও নানা প্রকার অনুষ্ঠানাদি আমদানী করে, পরিবেশকে খুবই আনন্দ ঘন করার চেষ্টা করা হয়। হুযুর (সাঃ)-এর যুগে বা তাবে' তাবেঈনের যুগে এ ধরণের কোন অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা ছিল বলে আমরা হাদীস কেতাবে পাই না। এখনও খোদ হুযুর (সাঃ)-এর জন্মস্থান মক্কায় এ ধরণের অনুষ্ঠানাদির রেওয়াজ আছে বলে কেউ বলতে পারে না।

যখন থেকে ধর্ম চর্চা শুরু করেছি, তখন থেকে জানতে পেরেছি যে, মিলাদ শরীফের নামে মৌলবী সাহেবান হুযুর (সাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে এমন সব আজগুবী অবাস্তব, তালমুদি কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করেন, যা রামায়ন মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী গুলোকেও হার মানায়। বাস্তবতার সাথে এ গুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক নবীর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে এ ধরণের কেচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। থাকাটাই স্বাভাবিক, কেননা কোন এক শিশু জন্ম গ্রহণ করলেই বুঝা যায় না যে, সে নবী হবে বা অন্য কিছু। যদি জন্মলগ্নে কারো ক্ষেত্রে তাঁর নবী-রসূল হওয়ার চিহ্ন পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হতো, তাহলে পরিণত বয়সে নবী দাবী করার সাথে সাথেই সকলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিত। বিরোধিতার কোন অবকাশই থাকত না। কিন্তু ইতিহাস বলে, সকল নবীর ক্ষেত্রেই বিরোধিতা হয়েছে, যেমন হয়েছে, আমাদের নবীজীর (সাঃ) জীবনেও, যদিও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর আনীত শরীয়তই সর্বতোভাবে সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত।

'জন্মের জন্যে কেউ দায়ী নয়। কর্মের জন্যেই দায়ী। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।' তাই নবীর জন্মের দিনের চাইতে যেদিন তিনি দাবী করেন সেদিনের গুরুত্ব অনেক অনেক বেশী। অবশ্য একথা ঠিক যে, নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের যে ব্যক্তি-জীবন, সেটাই নবী জীবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। সে জীবন হয়, সাধারণের মাঝে অসাধারণ, অসাধুতার মাঝে সাধুতার, অপুণ্যের মাঝে পুণ্যের, ধ্বংসের মাঝে গড়নের, লয়ের মাঝে স্থিতির। সে জীবন হয় অধঃপতনের মাঝে পুনরুত্থানের, নেতিবাচকতার মাঝে ইতিবাচকতা। মোটকথা, নবীর জীবনের সারাটা ক্ষণই হয় কল্যাণময়, মঙ্গলময়। নবুওয়াতের পূর্বেও তিনি থাকেন মানবমঙ্গল ও মানব-হিতৈষণার মূর্তপ্রতীক, পুণ্য ও ভালবাসার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাইতো কুরআন পাকে বলা হয়েছে—তোমাদের মধ্যে এ নবী [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] দীর্ঘদিন ধরে জীবন যাপন

(অবশিষ্টাংশ ৭২ পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

22nd September, 1991 (Seratunnabi Issue)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan